Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM

Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সবরের সুফল

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুইটি খাতুন

রোলঃ 227020586

২৯ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সবরের সুফল

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট

Through Knowledge towards Jannah

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুইটি খাতুন

রোলঃ 227020586

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " সবরের সুফল " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সুইটি খাতুন, আইডিঃ 227020586বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " সবরের সুফল " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

সুইটি খাতুন

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২৯ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

সুইটি খাতুন

আইডিঃ 227020586

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 1

সবরের সংজ্ঞা 2

সবর শব্দের অর্থ ও বিশ্লেষণ 4

সবরের প্রকারভেদ 7

কঠিন ও সহজ হওয়ার দিক থেকে সবর ২প্রকার 9

সবরের পদ্ধতি ও সুফল 11

সবরের গুরুত্ব ও ফজিলত 12

সফলতা অর্জনে সবরের গুরুত্ব 14

সবর বাড়ানোর পথ 15

যেভাবে সবরের চর্চা করবো 16

আকীদার মধ্যে সবরের স্থান 18

সবরকারীদের জন্য আল্লাহর পুরস্কার 26

সবর একটি মহৎ গুণ 28

সবর হলো নূর 31

সর্বাধিক কষ্টসাধ্য ধৈর্য 31

ধৈর্যধারণ জগতে সম্মানিত হওয়ার পথ 33

জগতের মুসিবতের উপর ধৈর্য 33

রবের কাছে দোয়ার মাধ্যমে ধৈর্যধারণ 34

তালিবে ইলমের জীবনে ধৈর্যধারণ 37

কুরআনের আলোকে সবরের বিভিন্ন আয়াত 38

সবর সংক্রান্ত হাদিস 40

আম্বিয়াগণের জীবনে সবরের পরিক্ষা 45

মুসা (আঃ) এর ধৈর্য 49
মুহাম্মাদ সাঃ এর জীবনে সবর 50
নামাজে বাধা ও নবীজির সবর 50
কাফেরদের নির্যাতনে নবীজির সবর 51
বিপদাপদে ও অনাহারে সবর 52
দ্বীনের পথে সাহাবিদের সবর 54
মানব জীবনে ধৈর্যের প্রয়োজনীয়তা 56
পারিবারিক জীবনে ধৈর্যের গুরুত্ব 58
দুর্যোগ আল্লাহর পরীক্ষা 60
উপসংহার 62
তথ্যসূত্র 63

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি পরম ধৈর্য্যশীল ও গুণাগ্রাহী সুউচ্চ সুমহান, সর্বজ্ঞানী, সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রোষ্টা ও সর্বশক্তিমান। ইসলাম এ পৃথিবীতে শুধুমাত্র নিছক ধর্ম হিসেবেই আবির্ভূত হয়নি বরং মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে জীবনব্যবস্থা হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। ইসলাম আমাদেরকে মহান আল্লাহর মুখাপেক্ষী হওয়া ও ধৈর্য্যধারণের শিক্ষা দিয়েছে। কুরআন মাজীদে সবর বা ধৈর্য্য শব্দটি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে এবং বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ তায়া'লা বহুবার এ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। বর্তমানে প্রচলিত অর্থে সবর বলতে শুধুমাত্র ধৈর্য্যধারণ করা, চুপচাপ সহ্য করাকেই বুঝানো হচ্ছে। যে শব্দগুলো শুনার সঙ্গে সঙ্গে মনে একটা জড়তা অসাড় ভাবের সৃষ্টি হয়। কিন্তু ধৈর্য্য বা সবরের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে দৃঢ় বা অটল থাকা অর্থাৎ কোনো উদ্দেশ্য অর্জন করতে অটলভাবে সমস্ত কিছু সহ্য করা। যত বাধা আসুক, বিপদ আপদ আসুক, যত কষ্ট আসুক কিছুতেই হতাশ বা ভেঙে না পড়ে সুদৃঢ়ভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। এটা হচ্ছে সবর বা ধৈর্যের দাবি। ধৈর্য্যকে সর্বোত্তম নিয়ামত অভিহিত করে বলা হয়েছে যে, সবর হচ্ছে সত্তনের মূল। রাসুল (সাঃ) এর মুখঃনিসৃত এক হাদিসে বলা হয়েছে ধৈর্য্য বা সবর হচ্ছে ঈমানের অর্ধেক। হযরত আলী (রাঃ) সবর বা ধৈর্য্যকে দেহের শির হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন দেহের জন্য শির যেমন ঈমানের জন্য ধৈর্য্য তেমন। অর্থাৎ মস্তক ছাড়া যেমন দেহের কোনো মূল্য নেই তেমনি ধৈর্য্যহীন ব্যক্তির ঈমানেরও তেমন মূল্য নেই। বস্তুত মহান আল্লাহ ধৈর্যকে মুমিনের ইহকালীন ও পরকালীন শান্তি মুক্তি ও নিরাপত্তার মাধ্যম বানিয়েছেন ফলে সে চরম সংকটেও দিক হারায় না।পরম আনন্দের স্বেচ্ছাচারিতায় মেতে উঠে না। বিরুপ পরিবেশ ও প্রতিকুল পরিস্থিতি ও তার সংকল্প টলাতে পারেনা। এভাবে তার মধ্যে শারীরিক মানসিক ও আত্মিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। তার চিন্তা, আচরণ ও সামগ্রিক কার্যকলাপে ভারসাম্য বজায় থাকে। এই ধৈর্যই তখন তার অজেয় শক্তিতে পরিণত হয়। অধিকন্তু শাশ্বত সত্যের ধারক মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ধৈর্যশোলদের অপরিমিত প্রতিদান দেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন। সেই সঙ্গে তাদের এই নিশ্চয়তাও প্রদান করেছেন যে, তিনি সবসময় তাদের সঙ্গে থাকবেন। সুখে দু:খে তাদের সঙ্গ দেবেন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ন্যায় ও কল্যাণের পথ দেখাবেন এভাবে তাদেরকে অপার্থিব সাহায্য ও সুস্পষ্ট বিজয় দান করবেন। মহান আল্লাহর এই সার্বক্ষণিক সঙ্গ ও নিকট সান্নিধ্যের সুবাদে

ধৈর্যশীলগণ ইহকাল ও পরকালের প্রভূত কল্যাণ অর্জন করে এবং তার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নিয়ামতরাজি লাভে ধন্য হয়। মহান আল্লাহ ধৈর্যশীলদের প্রতি তার অসীম ভালোবাসার কথা উল্লেখ করে ঘোষণা করেছেন, "আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালোবাসেন "। সান্নিধ্য প্রতিদান ও ভালোবাসা ছাড়াও তিনি ধৈর্যশীলদের অতিরিক্ত তিনটি বিষ্যের সুসংবাদ দিয়েছেন। এক. দয়া। দুই. করুনা। তিন. হিদায়াত। সুখী ও সৌভাগ্যবানরা সর্বোত্তম জীবনোপকরন লাভ করে তাদের ধৈর্যগুণে। মর্যাদা ও আভিজাত্যের শীর্ষচূড়ায় আরোহন করে কৃতজ্ঞতা ও অকৃতার্থতার কল্যাণে। ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতাকে পুজি করেই তারা চিরশান্তির জান্নাতের দিকে ধাবিত হয়। ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার ডানা মেলেই তারা জান্নাতের মুক্ত আকাশে উড়ে বেড়ায়। এই ধৈর্য এ কৃতজ্ঞতা মহান আল্লাহর অনুগ্রহ বিশেষ। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকেই কেবল এই অনুগ্রহ দান করেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।

সবরের সংজ্ঞা

ধৈর্যের আরবি প্রতিশব্দ হচ্ছে 'সবর'। এর শাব্দিক অর্থ বাধা দেয়া বা বিরত রাখা। তবে ব্যবহারিক দিক থেকে শব্দটি অবিচলতা, মনকে অস্থিরতা ও অতি আবেগ থেকে বিরত রাখা, জিহবাকে অভিযোগ প্রবনতা থেকে সংযত রাখা এবং দুঃখ ভারাক্রান্ত ও শোকাতুর সময়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, বুক ও কপাল চাপড়ে বিলাপ করা থেকে রক্ষা করা অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

কারো কারো মতে, এটি হলো মানুষের ভেতরগত একটি উত্তম স্বভাব, যার মাধ্যমে সে অসুন্দর ও অনুত্তম কাজ থেকে বিরত থাকে। এটি মানুষের এক আত্মিক শক্তি যা দিয়ে সে নিজেকে সুস্থ্য ও সুরক্ষিত রাখতে পারে।

জুনায়েদ বাগদাদী রহ. কে সবর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'হাসি মুখে তিক্ততার ঢোক গেলা।'

জুন্নুন মিসরী রহ. বলেন, 'আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ থেকে দূরে থাকা, বিপদের সময় শান্ত থাকা এবং জীবনের কুরুক্ষেত্রে দারিদ্রের কষাঘাত সত্ত্বেও অমুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করা।'

কারও মতে, 'সবর হলো সুন্দরভাবে বিপদ মোকাবিলা করা।'

আবার কারও মতে, 'বিপদকালে অভিযোগ-অনুযোগ না করে অমুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করাই সবর।

এক বুযুর্গ এক ব্যক্তিকে অন্যের কাছে তার সমস্যা নিয়ে অনুযোগ করতে শুনলেন। তিনি বললেন, 'তুমি ভাই, স্রেফ যে দয়া করে না তার কাছে দয়াকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছো। এর বেশি কিছু করোনি।'

এ সম্পর্কে আরও বলা হয়, 'তুমি যখন মানুষের কাছে অভিযোগ করো, তখন মূলত সদয়ের বিরুদ্ধে নির্দয়ের কাছেই অভিযোগ করো।'

অভিযোগ করাটা দুই ধরনের। একটি হলো, আল্লাহ তা'আলার কাছে অনুযোগ করা। এটি সবর পরিপন্থী নয়। যেমন ইয়াকুব আলাইহিস সালাম বলেন,

قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ

'সে বলল, 'আমি আল্লাহর কাছেই আমার দুঃখ বেদনার অভিযোগ জানাচ্ছি। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি যা জানি, তোমরা তা জান না।'

অপরটি হলো, নিজের মুখের বা শরীরের ভাষায় মানুষের কাছে অভিযোগ করা। এটি সবরের সঙ্গে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক। এটি সবর পরিপন্থী।

সবর বা ধৈর্য ধারণ করা আকীদার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। জীবনে বিপদ-মুসিবত নেমে আসলে অস্থিরতা প্রকাশ করা যাবে না। বরং ধৈর্য ধারণ করতে হবে। পাশাপাশি আল্লাহর নিকট প্রতিদান পাওয়ার আশা করতে হবে। ইমাম আহমদ

রহঃ বলেন, "আল্লাহ তায়ালা কুরআনে নব্বই স্থানে সবর সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।"

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, الصبر ضياء "সবর হল জ্যোতি।" (মুসনাদ আহমদ ও মুসলিম)

উমর রা. বলেন, "সবরকে আমরা আমাদের জীবন-জীবিকার সর্বোত্তম মাধ্যম হিসেবে পেয়েছি।" (বুখারী)

আলী রা. বলেন,"ঈমানের ক্ষেত্রে সবরের উদাহরণ হল দেহের মধ্যে মাথার মত। এরপর আওয়াজ উঁচু করে বললেন, "যার ধৈর্য নাই তার ঈমান নাই।"

আবু সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

مَا أَعْطَى اللَّهُ أَحَدًا مِنْ عَطَاءٍ أَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ

"আল্লাহ তায়ালা ধৈর্যের চেয়ে উৎকৃষ্ট এবং ব্যাপকতর দান কাউকে দেন নি।" (সুনান আবু দাউদ, অনুচ্ছেদ: নিষ্কলুষ থাকা। সহীহ)

সবর শব্দের অর্থ ও বিশ্লেষণ

কুরআন মাজীদে صبر শব্দটি বিভিন্নরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এর মূল অর্থ হল, নিজেকে সংকট, অপছন্দনীয় অবস্থা ও পরিস্থিতিতে সুনিয়ন্ত্রিত রাখা, হক ও নীতির ওপর অটল অবিচল রাখা। যদিও সবজায়গায় আভিধানিক অর্থের প্রভাব রয়েছে। কিন্তু শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে এর বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। আল্লামা রাগেব আস্ফাহানী রাহ. (মৃত্যু : ৫০২ হি.) তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'আলমুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন'-এ صبر -এর অর্থ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন,

والصبر حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع، أو عما يقتضيان حبسها عنه.

বিবেক-বুদ্ধি ও শরীয়ত যা করতে দাবি জানায়, নিজেকে তাতে নিয়োজিত করা আর যা থেকে দূরে থাকার দাবি জানায়, তা থেকে নিজেকে দূরে রাখা। আলমুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন, পৃ. ২৭৩

নিচে صبر শব্দটির শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে মৌলিক কিছু ব্যবহার তুলে ধরা হল,

এক. বিপদাপদে নিজেকে স্থির রাখা ও আল্লাহ তাআলার ফায়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوْعِ وَ نَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَ الْاَنْفُسِ وَ الثَّمَرٰتِ وَ بَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ،الَّذِيْنَ اِذَاۤ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْۤا اِنَّا لِلهِ وَ اِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْن.َ

আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব (কখনো) কিছুটা ভয়-ভীতি দ্বারা, (কখনো) ক্ষুধা দ্বারা এবং (কখনো) জান-মাল ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা। সুসংবাদ শোনাও তাদেরকে, যারা (এরূপ অবস্থায়) সবরের পরিচয় দেয়। যারা তাদের কোনো মুসিবত দেখা দিলে বলে ওঠে, আমরা সকলে আল্লাহরই এবং আমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। সূরা বাকারা (২) : ১৫৫-১৫৬

দুই. প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে গিয়ে গোনাহ ও অন্যায় থেকে নিজেকে দূরে রাখা এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান, তাঁর ইবাদাত-বন্দেগী ও দ্বীনের যাবতীয় বিধি-বিধান পালনে সদা তৎপর থাকা। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَ صَابِرُوْا وَ رَابِطُوْا وَ اتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْن.َْ

হে মু্মিনগণ! সবর অবলম্বন কর, মোকাবেলার সময় অবিচলতা প্রদর্শন কর এবং সীমান্ত রক্ষায় স্থিত থাক। আর আল্লাহকে ভয় করে চল, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। সূরা আলে ইমরান (৩) : ২০০

এখানে সবর শব্দটি অনেক ব্যাপক। এর অনেক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। যথা আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে অবিচলতা প্রদর্শন করা, গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার জন্য মনের ইচ্ছা ও চাহিদাকে দমন করা এবং কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করা। এখানে এই তিন প্রকার সবরই উদ্দেশ্য হতে পারে। (তাওযীহুল কুরআন, পৃ. ১৮৫)

তিন. জিহাদের ময়দানে শত্রুর মোকাবেলায় দৃঢ়পদ থাকা। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَ لَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَ جُنُوْدِهٖ قَالُوْا رَبَّنَاۤ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّ ثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَ انْصُرْنَا عَلَي الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ.َ

তারা যখন জালূত ও তার সৈন্যদের মুখোমুখি হল তখন তারা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে সবর দান কর এবং আমাদেরকে অবিচল-পদ রাখ। এবং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য ও বিজয় দান কর। সূরা বাকারা (২) : ২৫০

চার. যালেম ও অত্যাচারীদের যুলুম নির্যাতন সহ্য করা।

وَ لَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰي مَا كُذِّبُوْا وَ اُوْذُوْا حَتّٰۤي اَتٰىهُمْ نَصْرُنَا وَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللهِ وَ لَقَدْ جَآءَكَ مِنْ نَّبَاِي الْمُرْسَلِيْنَ.َ

বস্তুত তোমাদের পূর্বে বহু রাসূলকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল। কিন্তু তাদেরকে যে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে এবং কষ্ট দেওয়া হয়েছে তাতে তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল; যে পর্যন্ত না তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছেছে। এমন কেউ নেই, যে আল্লাহর কথা পরিবর্তন করতে পারে। (পূর্ববর্তী) রাসূলগণের কিছু ঘটনা তোমার কাছে তো পৌঁছেছেই। সূরা আনআম (৭) : ৩৪

এখানে শারীরিক ও মানসিক দুই ধরনের কষ্টই উদ্দেশ্য হতে পারে।

সবরের প্রকারভেদ

সবর প্রথমত দু'প্রকার—

(১) দৈহিক সবর; যেমন দৈহিক কষ্ট সহ্য করা এবং তাতে সুদৃঢ় থাকা।

(২) মানসিক সবর; যেমন মনকে কুপ্রবণতা ও কুপ্রবৃত্তি থেকে ফিরিয়ে রাখা।

প্রথম প্রকার সবর আবার দু'শ্রেণীতে বিভক্ত ।

১. নিজে কোন কঠিন কাজ কিংবা এবাদত পালন করা।

২. অপরের কঠিন প্রহার অথবা মারাত্মক যখম বরদাশত করা।প্রথম প্রকার সবর সবর শরীয়ত অনুযায়ী হলে উত্তম নতুবা নয় । কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার সবর সর্বাবস্থায় উত্তম। এ সবর যদি উৎকৃষ্ট খাদ্য ভক্ষণ ও যৌনাঙ্গের বাসনা থেকে করা হয়, তবে এর নাম হয় "ইফত" (সাধুতা)। যদি কোন বিপদাপদে এ সবর করা হয়, তবে একে সবরই বলা হয় এবং এর বিপরীত অবস্থাকে বলা হয় হা-হুতাশ করা। যদি বিত্ত-বৈভবের তাড়না সহ্য করার ক্ষেত্রে এ সবর করা হয়, তবে একে বলা হয়, "যবতে নফস" (আত্মসংযম)। এর বিপরীত অবস্থাকে বলা হয় আস্ফালন ।

যদি যুদ্ধক্ষেত্রে সবর করা হয়, তবে একে বলা হয় বীরত্ব ও শৌর্য। এর বিপরীত অবস্থাকে বলা হয় কাপুরুষতা। যদি ক্রোধ হযম ব্যাপারে সবর হয়, তবে এর নাম সহনশীলতা, যার বিপরীত হচ্ছে ক্রোধান্ধতা। যদি যামানার কোন আপদে সবর করা হয়, তবে এর নাম অসম সাহসিকতা এবং এর বিপরীত হচ্ছে স্বল্প সাহসিকতা। প্রয়োজনাতিরিক্ত জীবনোপকরণের বেলায় সবর করা হলে তার নাম সংসার নির্লিপ্ততা। এর বিপরীত সংসারাসক্তি।

সারকথা, ঈমানের অধিকাংশ গুণাবলীই সবরের অন্তর্ভুক্ত। এ কারণেই একবার জনৈক ব্যক্তি ঈমান কি প্রশ্ন করলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : সবর। এরূপ বলার কারণ এই যে, ঈমানের কর্মসমূহের মধ্যে সর্ববৃহৎ ও ভারী কর্ম হচ্ছে সবর। আল্লাহ তা'আলা সবরের প্রকার সমূহকে একত্রে উল্লেখ করে সবগুলোর নাম রেখেছেন সবর । এরশাদ হয়েছে-

যারা কষ্টে, দুর্ভিক্ষে এবং যুদ্ধের সময় সবর করে, তারাই সাচ্চা এবং তারাই খোদাভীরু ।

শয়তানী প্রেরণার সাথে ধর্মীয় প্রেরণার সংঘর্ষের দিক দিয়ে সবরের তিন প্রকার অবস্থা হয়ে থাকে।

(১) শয়তানী প্রেরণাকে এমনভাবে পরাভূত করে দেয়া যাতে তার মধ্যে মোকাবিলা করার কোন ক্ষমতা অবশিষ্ট না থাকে। সার্বক্ষণিক সবর দ্বারা এই অবস্থা অর্জিত হয় । এরূপ অবস্থায়ই বলা হয় من صبر ظفر যে সবর করে সে সফলকাম হয় । খুব কম লোকই এ অবস্থায় পৌঁছতে পারে । যারা পৌঁছতে সক্ষম হয়, তারা সিদ্দীক ও নৈকট্যশীল । তাঁরা আল্লাহ তা'আলাকে নিজের পালনকর্তা জেনে তাঁর উপরই সদা প্রতিষ্ঠিত থাকেন এবং কখনও সরল পথ বর্জন করেন না।

(২) শয়তানী প্রেরণায় বিজয়ী হওয়া এবং ধর্মীয় প্রেরণার মধ্যে মোকাবিলা করার শক্তি অবশিষ্ট না থাকা। এ অবস্থায়ই মানুষ নৈরাশ্যের শিকার হয়ে সর্বপ্রকার মোজাহাদা ও চেষ্টা-চরিত্র থেকে বিরত থাকে এবং গাফেলদের তালিকা ভুক্ত হয়ে যায়।

বাস্তবে এরূপ লোকদের সংখ্যাই অধিক। এরাই রিপু ও খেয়াল-খুশীর পূজারী। এদের প্রতিই নিম্নোক্ত আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে- আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেককে সরল পথের দিশা দিতে পারতাম; কিন্তু আমার পক্ষ থেকে এ উক্তি সত্যে পরিণত হয়েছে যে, আমি মানব ও জিন দ্বারা জাহান্নাম ভর্তি করে দেব । এরূপ লোকেরাই আখেরাতের বিনিময়ে পার্থিব জীবনকে গ্রহণ করে এবং চরমভাবে মার খায়। কেউ তাদেরকে পথপ্রদর্শন করতে চাইলে তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশ করা হয় : অর্থাৎ, তুমি সে ব্যক্তি

থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, যে আমার উপদেশের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে এবং পার্থিব জীবন ছাড়া অন্য কিছু কামনা করে না তাদের জ্ঞানের দৌড় এ পর্যন্তই ।

এ অবস্থার পরিচয় হচ্ছে চেষ্টা-চরিত্র থেকে নিরাশ হওয়া এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে গর্বিত থাকা। এটা চরম নির্বুদ্ধিতা। রসূলে (সাঃ) এরশাদ করেন : বিজ্ঞ সে ব্যক্তি, যে নিজেকে সংযত রাখে এবং মৃত্যুপরবর্তী অবস্থার জন্যে আমল করে। আর নির্বোধ সে ব্যক্তি, যে খেয়ালখুশীর অনুসরণ করে এবং আল্লাহর কাছে বাসনা করে ।

অর্থাৎ, কেউ তাকে উপদেশ দিলে সে বলে, আমি তওবা করার খুব ইচ্ছা রাখি; কিন্তু তা হয়ে উঠে না। তাই এর আশাও করি না। আর তওবার প্রতি আগ্রহ না থাকলে বলে, আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়ালু। অতএব, তওবার প্রয়োজন কি?

(৩) তৃতীয় অবস্থা হল, মোকাবিলা সমান সমান হওয়া । কখনও ধর্মীয় প্রেরণা বিজয়ী হবে এবং কখনও শয়তানী প্রেরণা। এরূপ ব্যক্তি জেহাদকারীদেরই অন্তর্ভুক্ত। বিজয়ীদের মধ্যে গণ্য নয়। তার অবস্থা নিম্নোক্ত আয়াতে বিধৃত হয়েছে— অর্থাৎ, তারা একটি সৎকাজ ও অপরটি অসৎকাজ মিশ্রিত করেছে । আর যারা কামনা-বাসনার সাথে জেহাদ করে না, তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং তার চেয়েও অধম। কেননা, চতুষ্পদ জন্তুর জন্যে মারেফত ও ক্ষমতা সৃষ্টি করা হয়নি যা দ্বারা তারা জেহাদ করবে। কিন্তু মানুষকে ক্ষমতা দান করা হয়েছে, যা সে কাজে লাগায় না।

কঠিন ও সহজ হওয়ার দিক থেকে সবর ২প্রকার

এক, এমন সবর, যা সহজলভ্য নয়, কঠোর পরিশ্রম সাপেক্ষ। এর নাম জোরপূর্বক সবর।

দুই, যা পরিশ্রম ছাড়াই অর্জিত হয়ে যায়। মানুষ যখন সদাসর্বদা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং শুভ পরিণামের দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, তখন সবর সহজলভ্য হয়ে যায় । আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন- অর্থাৎ, অতএব যে দান করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং পুণ্যকর্মকে সত্য জ্ঞান করে, আমি তাকে সহজে লক্ষ্যে পৌঁছে দেব ।

মোটকথা, দীর্ঘদিন অভ্যাসের ফলে যখন সবর সহজ হয়ে যায়,"রেযা" অর্থাৎ সন্তুষ্টির মকাম হাসিল হয়। কারণ রেযার মর্তবা সবরের ঊর্ধ্বে ।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর সন্তুষ্টির মাধ্যমে। যদি তা সম্ভব না হয়, তবে অপ্রিয় বিষয়ে সবর করার মধ্যে অনেক কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

এখন জানা দরকার যে, কতক সবর ফরয, কতক নফল, কতক মাকরূহ এবং কতক হারাম।

শরীয়তের নিষিদ্ধ কর্মসমূহে সবর করা ফরয। মাকরূহ বিষয়াদিতে সবর করা নফল । যে পীড়ন শরীয়তে নিষিদ্ধ তাতে সবর করা হারাম। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তির বিবাহিতা স্ত্রীর সাথে অপর এক ব্যক্তি ব্যভিচার করার সংকল্প করল । এতে তার আত্মমর্যাদাবোধ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। কিন্তু সে তা প্রকাশ করার ব্যাপারে সবর করল এবং চুপচাপ দেখে গেল । বলা বাহুল্য, এ ক্ষেত্রে সবর করা সম্পূর্ণ হারাম। যে পীড়ন শরীয়তে মাকরূহ—হারাম নয়, তাতে সবর করা মাকরূহ।

মোটকথা, সবরের কষ্টিপাথর জানা দরকার । সবর ঈমানের অর্ধেক কেবল একথা জেনে মনে করা উচিত নয় যে, সকল সবরই উত্তম।

সবরের পদ্ধতি ও সুফল

ছোট-বড় বিপদাপদে আমরা সবাই কম-বেশি আক্রান্ত হই। মাঝেমধ্যে বিপদ এত প্রকট হয়ে যায় যে মনে হয় সামনে আর কোনো রাস্তা নেই। চারদিকে শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। সত্যিই এমন পরিস্থিতিতে যে আক্রান্ত হয়েছে সে-ই বোঝে এর ভয়াবহতা কত।

কিন্তু এমন নিকষ কালো বিপদে নিমজ্জিত ব্যক্তির জন্য আছে একপশলা আশার আলো, যা দিয়ে ও গ্লানিমুক্ত হয়ে পবিত্র হতে পারে। হৃদয়ের কোণে জমে থাকা মরীচিকা ও ধুলাবালি দূর করে নিতে পারে।

চিন্তামুক্ত জীবন জান্নাতে : আল্লাহ তাআলা দুনিয়াকে দারুল ইবতেলা বা পরীক্ষাগার বানিয়েছেন। এখানে কষ্ট, ক্লান্তি দুশ্চিন্তা সব মিলিয়ে বসবাস করতে হবে।

আর পরকালের জীবন সেখানে কোনো দুশ্চিন্তা নেই। দুনিয়াতে যে আমল করেছে তার প্রতিদান ভোগ করবে সেই স্থায়ী নিবাসে। আল্লাহ তাআলা বলেন, এবং তারা বলবে, 'প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূরীভূত করেছেন; নিশ্চয়ই আমাদের রব পরম ক্ষমাশীল, অসীম গুণগ্রাহী। যিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদের স্থায়ী আবাসে প্রবেশ করিয়েছেন সেখানে কোনো ক্লেশ আমাদের স্পর্শ করে না এবং কোনো ক্লান্তিও স্পর্শ করে না।' (সুরা ফাতির, আয়াত : ৩৪-৩৫)

সবরের প্রকৃত রূপ : আমার কোনো আত্মীয়-স্বজন, নিকটাত্মীয় ইন্তেকাল করেছেন; এ ক্ষেত্রে আমি একদম নিশ্চুপ বসে থাকার নাম সবর বা ধৈর্য নয়; বরং সবর হচ্ছে নিজের মনের কামনা ও খায়েশ থেকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করা। মানুষের মাঝে দুটি শক্তি রয়েছে, একটি শক্তি তাঁর দ্বিনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে, আর অন্য শক্তি কুমন্ত্রণা; যা দ্বিনের ওপর বিজয়ী হওয়ার চেষ্টা করে। সুতরাং দ্বিনকে তার ওপর বিজয়ী করার নামই হচ্ছে সবর। নিজের আত্মাকে এমন জিনিসের ওপর আবদ্ধ রাখা যা সে অপছন্দ করে। (মাসায়েব আওর উনকি ইলাজ : ১১৭)

সবর ঈমানের অর্ধেক : বিপদাপদ ও দুশ্চিন্তায় প্রকৃত মুমিন সবর করবে।

মুমিন এ কথা বিশ্বাস করবে, আল্লাহ তাআলা আমাকে বিভিন্ন জিনিসের কোষাধ্যক্ষ হিসেবে বানিয়েছে। তিনি আমাদের কাছে এগুলো আমানত রেখেছেন। যদি তিনি তাঁর জিনিস নিয়ে যান, এতে আমার আপত্তির কী আছে! উপরন্তু আমি এর ওপর ধৈর্য ধারণ করি তাহলে আমাকে এর বিনিময় দান করবেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ধৈর্য ঈমানের অর্ধেক।' (শুআবুল ঈমান, হাদিস : ৩১৮০)

বিপদাপদ সবার কাছে প্রকাশ করবে না : অধৈর্য হয়ে অনেক সময় আমরা সব জায়গায় নিজের বিপদের কথা বলেই ঘুরে বেড়াই। এটি সবরের পরিপন্থী। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) রাসুল (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, 'যে ব্যক্তি নিজের বিপদাপদ সবার কাছে বলে বেড়ায় সে ধৈর্য ধারণকারী নয়।' (দুররে মানসুর : ৮/৩১১)

আল্লাহ তাআলা আমাকে দেখছেন : বিপদাপদে আক্রান্ত ব্যক্তি মনে মনে এ কথা ভাবা এবং বিশ্বাস করা, আমার প্রভু আমার সৃষ্টিকর্তা প্রতিমুহূর্তে আমাকে দেখছেন। আমি ন্যায়ের পথে থাকলে তিনি আমার জন্য ভালোটাই করবেন। এভাবে যখন কোনো ব্যক্তি ভাববে তার কষ্ট কিছু হলেও কমতে থাকবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর আপনি ধৈর্যধারণ করুন আপনার রবের সিদ্ধান্তের ওপর, নিশ্চয়ই আপনি আমাদের চক্ষুর সামনেই আছেন। আপনি আপনার রবের প্রশংসা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন, যখন আপনি দণ্ডায়মান হন।' (সুরা তুর, আয়াত : ৫২)

সবরের গুরুত্ব ও ফজিলত

এ পৃথিবী যেহেতু পরীক্ষাক্ষেত্র। তাই নানাভাবে মানুষের জীবনে বিভিন্নমুখী পরীক্ষা আসবে। নানারকম বিপদাপদ আসবে। তাকে এ পরীক্ষায় ও বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। সেই কঠিন বিপদাপদে তাকে উত্তীর্ণ হতে হবে। তাই আল্লাহ তায়ালা মানুষকে কুরআন মাজীদের নানা জায়গায় ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি তাঁর প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-কে এ বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে বলেন : (সুতরাং হে রাসূল!) তুমি সবর অবলম্বন কর, যেমন সবর অবলম্বন করেছিল দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ এবং

তুমি তাদের (অর্থাৎ কাফেরদের) বিষয়ে তাড়াহুড়া করো না। তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হচ্ছে, যেদিন তারা তা দেখবে, সেদিন (তাদের মনে হবে) তারা যেন (দুনিয়ায়) দিনের এক মুহূর্তের বেশি অবস্থান করেনি। এটাই সেই বার্তা, যা পৌঁছিয়ে দেয়া হলো। অতঃপর ধ্বংস তো হবে কেবল এমন সব লোক, যারা অবাধ্য। (সূরা আহকাফ : ৩৫)।

তিনি মুমিনদেরকে নির্দেশ দিয়ে বলেন : হে মুমিনগণ! সবর অবলম্বন কর, মোকাবেলার সময় অবিচলতা প্রদর্শন কর এবং সীমান্ত রক্ষায় স্থিত থাক। আর আল্লাহকে ভয় করে চলো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। (সূরা আলে ইমরান : ২০০)।

বিপদাপদে ধৈর্য ধারণকারীদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য করার ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি ইরশাদ করেন : হে মুমিনগণ! সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবরকারীদের সঙ্গে আছেন। (সূরা বাকারা : ১৫৩)।

যারা ধৈর্য ধারণ করে, তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। জটিল থেকে জটিল অবস্থায় সহজ পথ দেখান। এবং জীবনের নানা ধাপে তাদেরকে সফলতা দান করেন। তিনি ইরশাদ করেন : যারা তাদের কোনো মুসিবত দেখা দিলে বলে ওঠে, আমরা সকলে আল্লাহরই জন্য এবং আমাদেরকে তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে। এরাই তারা, যাদের প্রতি তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে বিশেষ করুণা ও দয়া রয়েছে এবং এরাই আছে হেদায়েতের ওপর। (সূরা বাকারা : ১৫৬-১৫৭)।

আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদে ধৈর্য ধারণকারীদেরকে বিভিন্ন প্রতিদানের কথা শুনিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেন : তোমাদের কাছে যা কিছু আছে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর আল্লাহর কাছে যা আছে তা স্থায়ী। যারা সবর করে আমি তাদের উৎকৃষ্ট কাজ অনুযায়ী অবশ্যই তাদেরকে প্রতিদান দেব। (সূরা নাহল : ৯৬)।

আরো ইরশাদ হয়েছে : এরূপ ব্যক্তিদেরকে তাদের প্রতিদান দেয়া হবে দ্বিগুণ। কেননা তারা সবর অবলম্বন করেছে, তারা মন্দকে প্রতিহত করে ভালোর দ্বারা এবং আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে। (সূরা কাসাস : ৫৪)। তিনি

আরো বলেন : আর আমি তাদের মধ্যে কিছু লোককে যখন তারা সবর অবলম্বন করল এমন নেতা বানিয়ে দিলাম, যারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পথপ্রদর্শন করত এবং তারা আমার আয়াতসমূহে গভীর বিশ্বাস রাখত। সূরা সাজদা (৩২) : ২৪

উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলামে সবর ও ধৈর্যের বিষয়টি কতো তাৎপর্যপূর্ণ ও কতো অর্থবহ। ইহকালের শান্তি ও রহমত থেকে শুরু করে পরকালের শান্তি ও সুখের নিশ্চয়তা দান করে এই সবর ও ধৈর্য। তাই তো রাসূলে কারীম (সা.) সবর বা ধৈর্যকে আলো সাব্যস্ত করেছেন। ইরশাদ হয়েছে : সবর ও ধৈর্য হলো আলো। (মুসনাদে আহমাদ : ২২৯০২)।

অর্থাৎ সবর ও ধৈর্য জীবনকে আলোকিত করে। জীবনের সকল অঙ্গনকে করে দেয় দ্যূতিময়। তাই জীবনকে রাঙ্গাতে, জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে আলোর ছোঁয়া পেতে আমাদেরকে অবশ্যই সবর অবলম্বন করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে যাবতীয় অর্থেই সবরকারী ও ধৈর্যশীল হওয়ার তাওফীক দান করুন- আমীন।

সফলতা অর্জনে সবরের গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারিমের ধৈর্যশীলদের অফুরন্ত প্রতিদান দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন, 'নিশ্চয়ই ধৈর্যশীলদেরকে অপরিমিত পুরস্কার পুরোপুরিভাবেই দেয়া হবে।' (সুরা যুমার : আয়াত ১০)। বিপদ-আপদে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করাই সবর বা ধৈর্যধারণের শেষ কথা নয়; বরং ইসলামের বিধান পালনে ধৈর্য ধারণ করা অনেক জরুরি। অর্থাৎ সবর সফলতা লাভের মূলমন্ত্র হওয়ার বাস্তব ও যুক্তিসঙ্গত কারণ হলো- ইসলাম যে রুকনগুলোর ওপর প্রতিষ্ঠিত, সেগুলো পালন করার জন্য সবরের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি।মানুষ ঈমান গ্রহণ থেকে শুরু করে সমাজে নামাজ প্রতিষ্ঠা; জাকাত আদায়ের ব্যবস্থা; মাসব্যাপী কামরিপু নিবারণ ও উপবাস করে রোজা পালন; অর্থ ও কষ্ট সহ্য করে হজ পালন করা মহা ধৈর্যের ব্যাপার।দুনিয়ায় ধর্মীয় রীতি-নীতি না মেনে জীবন-যাপন যেমন আনন্দদায়ক; ঠিক ধর্মীয় নীতি-রীতি মেনে জীবন পরিচালনা করা অনেক

কষ্টকর। তাই ইসলামের বিধান পালনে ধৈর্যধারণ করা আবশ্যক।এ কারণেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবর বা ধৈর্যধারণকে ঈমানের পরিচায়ক বলে উল্লেখ করেছেন। সবরের গুরুত্ব তুলে ধরে বিশ্বনবি বলেন, 'ধৈর্যের বিনিময় হলো জান্নাত।'আল্লাহ তাআলাও ধৈর্যধারণকারীদের শ্রেষ্ঠ পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন। সুরা নাহলের ৯৬নং আয়াতে এসেছে, 'যারা ধৈর্যধারণ করে আমি নিশ্চয়ই তাদেরকে তারা যে কাজ করে তা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করব।'পরিশেষে...উল্লেখিত কুরআনের আয়াত ও হাদিস থেকে বুঝা যায় যে, সত্যিকারার্থে মানব জীবনে সফলাতা লাভের অন্যতম মাধ্যম হলো সবর বা ধৈর্যধারণ করে দৈনন্দিন জীবনের সব কাজ ইসলামের নিয়মানুযায়ী যথাযথ পালন করা।সবর বা ধৈর্য ছাড়া যেমন ঈমানের পরিপূর্ণতা আসে না। ঠিক তেমনি নামাজ, রোজা, হজ ও জাকাতের বিধান পালনেও ধৈর্যের বিকল্প নেই।আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে দুনিয়ার সব বিপদাপদে ইসলামের বিধান পালনে ধৈর্যধারণ করে পরকালের সফলতা লাভ করার তাওফিক দান করুন।

সবর বাড়ানোর পথ

ধৈর্য সৌভাগ্যের প্রতীক। ধৈর্যহীন ব্যক্তি আলোহীন মশালের মতো। ধৈর্য জন্মগত কিংবা পৈতৃকসূত্রে পাওয়া কোনো কিছু নয়। কেউ যদি নিজেকে ধৈর্যশীল বান্দা হিসেবে গড়ে তুলতে চায় তাহলে তার জন্য সম্ভব।

কারণ ধৈর্য এমন ফুল, যা সব জায়গায় সুবাস ছড়ায়। আল্লাহ তাআলা কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় ধৈর্যশীলদের প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করো এবং নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করবে না, করলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে। আর ধৈর্য ধারণ করো।

নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।' (সুরা আনফাল, আয়াত : ৪৬)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর আমরা তোমাদের অবশ্যই পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা। আর আপনি সুসংবাদ দিন ধৈর্যশীলদের।' (সুরা বাকারা, আয়াত : ১৫৫)

যেভাবে সবরের চর্চা করবো

এক. এ কথা বিশ্বাস করা যে সব কিছুর রাজত্ব একমাত্র আল্লাহর।

ইরশাদ হয়েছে, 'তিনি যা চান তা-ই করতে পারেন। তাঁর কোনো কাজের ওপর প্রশ্ন করার কারো কোনো অধিকার নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন, তিনি যা করেন সে বিষয়ে তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন না; বরং তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে।' (সুরা আম্বিয়া, আয়াত : ২৩)

দুই. সব বিষয় আল্লাহর কাছে লিপিবদ্ধ আছে। আমার কখন কোন মুসিবত আসবে তা আল্লাহর কাছে লিপিবদ্ধ আছে। অসুস্থতা, দারিদ্র্য, দুঃখ-বেদনা যাবতীয় কল্যাণ-অকল্যাণ সব কিছু আল্লাহর কাছে লিপিবদ্ধ আছে, এ ধারণা একজন মুমিন সর্বদাই পোষণ করে। ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, 'যদি সব উম্মত তোমার কোনো উপকারের উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়, তাহলে ততটুকু উপকার করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। অন্যদিকে যদি সব উম্মত তোমার কোনো ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে একতাবদ্ধ হয়, তাহলে ততটুকু ক্ষতি করতে সক্ষম হবে, যতটুকু আল্লাহ তাআলা তোমার তকদিরে লিখে রেখেছেন। কলম তুলে নেওয়া হয়েছে এবং লিখিত কাগজও শুকিয়ে গেছে।' (তিরমিজি, হাদিস : ২৫১৬)

তিন. এ কথা বিশ্বাস করা, পৃথিবীতে যত মানুষ এসেছে কেউ-ই আপদমুক্ত নয়। ছোট-বড় বিপদাপদে সবাই আক্রান্ত হয়েছে। এ দুনিয়া বিপদের জায়গা। তাই এমন ধারণা

পোষণ করা যে আমার কোনো ধরনের বিপদাপদ আসবে না, তা চরম ভুল; বরং এর মধ্যে বেঁচে থাকতে হবে। আল্লাহ তাআলা কখনো কখনো পরীক্ষার জন্য বিপদ দিয়ে থাকেন, আবার গুনাহ মাফ করার জন্য বিপদ দিয়ে থাকেন, বান্দাকে আরো আল্লাহর নৈকট্য করে তোলার জন্য বিপদ দিয়ে থাকেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'মানুষ কি মনে করেছে যে আমরা ঈমান এনেছি—এ কথা বললে তাদের পরীক্ষা না করে অব্যাহতি দেওয়া হবে?' (সুরা আনকাবুত, আয়াত : ২-৩)

চার. বান্দা যেন বিপদে পড়ে আল্লাহর কাছে ফিরে আসে, সে জন্য আল্লাহ বান্দাকে ছোট-বড় বিপদ দিয়ে থাকেন; এই বিশ্বাস স্থাপন করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যারা তাদের ওপর বিপদ এলে বলে, আমরা তো আল্লাহরই। আর নিশ্চয়ই আমরা তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী।' (সুরা বাকারা, আয়াত : ১৫৬)

পাঁচ. বান্দার জানা নেই তার জন্য কোনটা কল্যাণকর আর কোনটা অকল্যাণকর। তাই কখনো কখনো বিপদ তার জন্য আশীর্বাদ নিয়ে আসে। আল্লাহ তাআলা কোরআনে স্পষ্ট করে বলেছেন, 'তোমরা যা অপছন্দ করো হতে পারে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং যা ভালোবাসো, হতে পারে তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন তোমরা জানো না।' (সুরা বাকারা, আয়াত : ২১৬)

ছয়. এ কথা চিন্তা করা যে দুনিয়া কারো স্থায়ী জায়গা নয়; বরং এটি একটি স্টেশনের মতো। তাই ছোট ছোট মসিবতের ওপর যদি ধৈর্য ধারণ করি, তাহলে আল্লাহ তাআলা এর জন্য অনেক বড় বিনিময় দান করবেন। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেছেন, 'দুনিয়া মুমিনের জন্য কয়েদখানা এবং কাফিরের জন্য জান্নাততুল্য।' (মুসলিম, হাদিস : ৭৩০৭)

সাত. বিপদাপদে এ কথা মনে করা যে আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে বিভিন্ন নবী-রাসুল ও তাঁর প্রিয় বান্দাদের নানাভাবে পরীক্ষা করেছেন। আমাকেও পরীক্ষা করে আমাকে নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করবেন। নিশ্চয়ই বিপদের সঙ্গে মুক্তি আছে, কষ্টের সঙ্গে আছে স্বস্তি। এ ছাড়া একজন মুমিনের এ কথা বিশ্বাস রাখা চাই যে আল্লাহ তাআলা বান্দাকে এমন কোনো মসিবত দেন না, যা তার সক্ষমতার বাইরে। আল্লাহ তাআলা

বলেন, ‘আল্লাহ কারো ওপর এমন কোনো দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না, যা তার সাধ্যাতীত।’ (সুরা বাকারা, আয়াত : ২৮৬)

আট. দুনিয়ার কোনো মানুষ যদি কষ্ট দিয়ে থাকে, তাহলে এর জন্য সুন্দর ব্যাখ্যা বের করার চেষ্টা করা। যেকোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে একটি সুন্দর ব্যাখ্যা দাঁড় করানো। যেমন— কোনো ব্যক্তি আপনাকে রূঢ় ভাষায় আক্রমণ করেছে। আপনি মনে মনে ভাবলেন, লোকটা মনে হয় এমনিতেই রাগী। তাই আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলেছে। তার স্বভাব এটা। সুন্দরভাবে কারো সঙ্গে কথা বলতে না পারা, এটা এক ধরনের তার অসুস্থতা।

এ ছাড়া যারা ধৈর্যশীলদের সংশ্রবে যায়, তাদের মধ্যে এই গুণ ধীরে ধীরে চলে আসবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে ধৈর্যশীল বান্দা হওয়ার তাওফিক দান করুন।

আকীদার মধ্যে সবরের স্থান

ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম لو (যদি) শব্দ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। বিশেষ করে মানুষ যখন মুছীবতে আক্রান্ত হয়। মুছীবতের সময় মানুষের উপর আবশ্যক হলো সবর করা এবং এর বিনিময়ে ছাওয়াবের আশা করা। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহিমাহুল্লাহ বলেন, আল্লাহ তা‘আলা তার কিতাবের নববই স্থানে সবরের কথা উল্লেখ করেছেন। সহীহ হাদীছে এসেছে, الصَّبْرُ ضِيَاءٌ ‘‘সবর জ্যোতিস্বরূপ’’।

উমার রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, وَجَدْنَا خَيْرَ عَيْشِنَا بِالصَّبْرِ ‘‘সবরের মাধ্যমেই আমরা সর্বোত্তম জীবন লাভ করেছি’’।

আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, দেহের মধ্যে মাথার মর্যাদা যেমন, ঈমানের মধ্যে সবরের মর্যাদা ঠিক সেরকমই। অতঃপর তিনি আওয়াজ উঁচু করে বললেন, জেনে

রাখো! যার সবর নেই, তার ঈমান নেই’’। ইমাম বুখারী ও মুসলিম মারফু সূত্রে বর্ণনা করেছেন, সবরের চেয়ে উত্তম অনুদান কাউকে প্রদান করা হয়নি।

الصبر শব্দটি صَبَرَ থেকে গৃহীত হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ বাধা প্রদান করা ও বিরত রাখা। যখন বাধা প্রদান করা হয় ও বিরত রাখা হয় তখন আরবীতে বলা হয় صبر। অধৈযর্তা-উৎকণ্ঠা প্রকাশ করা থেকে নফসকে বিরত রাখা, অভিযোগ পেশ করা, বিরক্তি প্রকাশ করা থেকে জবানকে বিরত রাখা এবং মুছীবতে পড়ে গালে চপেটাঘাত করা এবং জামা ছিড়ে ফেলা থেকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহকে বিরত রাখাকে الصبر বলা হয়। সুতরাং সবর তিন প্রকার। আল্লাহ তা‘আলা যা আদেশ করেছেন, তা পালন করতে গিয়ে সবর করা, তিনি যা থেকে নিষেধ করেছেন তা বর্জন করার ক্ষেত্রে সবর করা এবং তাক্বদীর অনুযায়ী যেসব মুছীবত আসে তাতে সবর করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

‘‘আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো বিপদ আসে না। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে, তিনি তার অন্তরকে সুপথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক অবগত’’। (সূরা তাগাবুন: ১১)

আলকামা রহিমাহুল্লাহ বলেন, আয়াতে এমন ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে, যে মুছীবতের সময় বিশ্বাস করে, এটি আল্লাহর পক্ষ হতেই। অতঃপর তাতে সন্তুষ্ট থাকে এবং তাক্বদীরকে মেনে নেয়। অন্যরা আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, মুছীবতে আক্রান্ত হয়ে যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে, এটি আল্লাহ নির্ধারণ অনুযায়ী হয়েছে অতঃপর সে সবর করে, ছাওয়াব কামনা করে এবং আল্লাহর ফায়ছালার সামনে আত্মসমর্পন করে, আল্লাহ তার অন্তরকে হিদায়াত করেন। সেই সঙ্গে দুনিয়ার সম্পদ থেকে যা তার হাত ছাড়া হয়ে যায়, তার বিনিময়ে আল্লাহ তা‘আলা তার অন্তরে হিদায়াত এবং সুদৃঢ় বিশ্বাস প্রদান করেন। কখনো কখনো তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া জিনিস ফেরত দেয়া হয়।

সাঈদ ইবনে জুবাইর রাহিমাহুল্লাহ বলেন, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَه ‘‘যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে, তিনি তার অন্তরকে সুপথ প্রদর্শন করেন’’, এর অর্থ হলো হাতছাড়া

হওয়া জিনিস কেবল সে আল্লাহ তা'আলার কাছেই ফেরত চায় এবং ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাযিউন পাঠ করে।

উপরোক্ত আয়াতে দলীল পাওয়া যায় যে, আমলসমূহ ঈমানের অন্তর্ভুক্ত এবং ধৈর্যধারণ করা অন্তরের হিদায়াত লাভের মাধ্যম। মুমিন ব্যক্তি প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সবরের প্রতি মুহতাজ। আল্লাহর আদেশগুলো বাস্তবায়ন করা এবং তার নিষেধগুলো থেকে দূরে থাকার ক্ষেত্রে তার নফসকে ধৈর্যধারণ করার উপর বাধ্য করা আবশ্যক।

আল্লাহ তা'আলার দিকে দাওয়াত দিতে গিয়ে বান্দা যেসব কষ্টের সম্মুখীন হয়, তাতে সে সবরের প্রতি মুখাপেক্ষী। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ (١٢٦) وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾

"হে নবী! প্রজ্ঞা এবং উত্তম উপদেশের মাধ্যমে তোমার রবের পথে মানুষকে দাওয়াত দাও এবং লোকদের সাথে বিতর্ক করো সর্বোত্তম পদ্ধতিতে। তোমার রবই অধিক জানেন কে তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং কারা সঠিক পথে রয়েছে, এ বিষয়ে তিনিই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন। তোমরা যদি প্রতিশোধ গ্রহণ করো, তাহলে ঠিক ততটুকু গ্রহণ করবে যতটুকু অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে। আর তোমরা যদি ধৈর্যধারণ করো, তাহলে অবশ্যই ধৈর্যশীলদের জন্য সেটিই উত্তম। তুমি ধৈর্যধারণ করো। তোমার ধৈর্যধারণ তো হবে আল্লাহর সাহায্যেই"। (সূরা আন নাহাল: ১২৫-১২৭)

সৎ কাজের আদেশ এবং অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করতে গিয়ে মানুষের তরফ থেকে যেসব যুলুম-নির্যাতন আসে তাতেও সবর করা আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলা লুকমান আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেন যে, তিনি তার ছেলেকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিলেন,

﴿يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾

“হে বৎস! যথারীতি সালাত কায়েম করো। সৎকাজের নির্দেষ দাও, অসৎকাজে বাধা দান করো এবং আপদে-বিপদে ধৈর্যধারণ করো। নিশ্চয় এটি দৃঢ় সংকল্পের কাজ”। (সূরা লুকমান: ১৭)

পার্থিব জগতে মুমিন বান্দা যেসব মুছীবতের সম্মুখীন হয়, তাতে সে সবরের মুখাপেক্ষী। এ ক্ষেত্রে তাকে জানতে হবে যে, এগুলো আল্লাহর পক্ষ হতেই। অতঃপর সে সন্তুষ্ট থাকবে ও তাক্বদীরকে মেনে নিবে। বিরক্তি ও অসন্তোষ প্রকাশ করা থেকে নিজের নফ্সকে বিরত রাখবে। বিশেষ করে যখন জবান ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে তা প্রকাশিত হওয়ার উপক্রম হবে, তখন জবান ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে নিয়ন্ত্রণ করবে।

এটি আকীদার অন্যতম মূল বিষয়। তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস করা ঈমানের ছয় রুকনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি রুকন। আপদে-বিপদে ধৈর্যধারণ করা এর সুফল। মুছীবতে পড়ে বান্দার ধৈর্যধারণ করতে না পারা ঈমানের এ রুকনের প্রতি তার ঈমান না থাকার প্রমাণ কিংবা এর প্রতি তার ঈমানী দুর্বলতার পরিচয়। পরিণামে সে আপদে-বিপদে অধৈর্যতা, অস্থিরতা ও বিরক্তি প্রকাশ করবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন যে, এটি এমন কুফুরী, যা ইসলামী আকীদাকে নষ্ট করে ফেলে।

সহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

اِثْنَتَانِ فِيْ النَّاس هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ الطَّعْنُ فِى الأَنْسَابِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ

“মানুষের মধ্যে এমন দু’টি মন্দ স্বভাব রয়েছে যা দ্বারা তাদের কুফুরী প্রকাশ পায়। একটি হচ্ছে মানুষের বংশের মধ্যে দোষ লাগানো, অপরটি হচ্ছে মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা”।

এ দু'টি স্বভাব কুফুরীর অন্তর্ভুক্ত। কেননা তা জাহেলী যামানার লোকদের স্বভাব ছিল। তবে যার মধ্যে কুফুরীর কোনো স্বভাব পাওয়া যায় সে সম্পূর্ণরূপে কাফের হয়ে যায়না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর বাণী: ليس بين العبد وبين الكفر أوالشرك إلا ترك الصلاة এর মধ্যে আলিফ-লামযুক্ত মারেফা (নির্দিষ্ট) الكفر শব্দটি এবং আলিফ-লাম ছাড়া নাকেরা (অনির্দিষ্ট) كفر শব্দটির মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। যেখানে كفر শব্দটির সাথে আলিফ-লাম যুক্ত হয়ে الكفر হবে, সেখানে উদ্দেশ্য হবে ইসলাম থেকে সম্পূর্ণ বের হয়ে যাওয়া। আর আলিফ-লাম ছাড়া আসলে সেরকম অর্থ হবে না এবং সেই কুফুরী মুসলিমকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় না।
বুখারী ও মুসলিমে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

''যে ব্যক্তি মুছীবতে পড়ে স্বীয় গালে চপেটাঘাত করে, বুকের জামা ছিড়ে এবং জাহেলী যুগের ন্যায় চিৎকার করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়''।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ ''জাহেলী যুগের ন্যায় চিৎকার করে'' এর ব্যাখ্যায় আল্লামা ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেন: জাহেলী যামানার চিৎকার বলতে এখানে জাতীয়তাবাদ এবং গোত্র প্রীতির দিকে আহবান করার কথা বলা হয়েছে। এমনি মাযহাব, দল এবং শাইখদের জন্য গোঁড়ামি করাও জাহেলিয়াতের আহবানের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপ কোনো শাইখকে অন্য কারো উপর প্রাধান্য দিয়ে তার দিকে আহবান করা, এর উপর ভিত্তি করেই কাউকে বন্ধু বানানো, কাউকে শত্রু বানানো। এ সবগুলোই জাহেলিয়াতের দাওয়াতের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ তা'আলা এক মহান উদ্দেশ্যে তার বান্দাদেরকে বিভিন্ন আপদ-বিপদ ও মুছীবত দ্বারা আক্রান্ত করে থাকেন।

(১) এর মাধ্যমে মানুষের গুনাহ-খাতা মাফ হয়। আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِى الدُّنْيَا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَفَّى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"আল্লাহ তা'আলা যখন তার কোনো বান্দার মঙ্গল করতে চান, তখন দুনিয়াতেই তার অপরাধের শাস্তি দিয়ে থাকেন। পক্ষান্তরে তিনি যখন তার কোনো বান্দার অমঙ্গল করতে চান, তখন দুনিয়াতে তার পাপের শাস্তি দেয়া হতে বিরত থাকেন, যেন কিয়ামতের দিন তাকে পূর্ণরূপে শাস্তি দেন"।[5] ইমাম তিরমিযী হাদীছটি বর্ণনা করেছেন এবং হাকেম হাসান বলেছেন।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন, বিপদ-আপদ এক প্রকার নিয়ামত। কেননা এটি বান্দার গুনাহসমূহ মোচন করে দেয়। আর এটি সবরের আহবান জানায়। সবর করলে ছাওয়াব প্রদান করা হয়। মুছীবত মানুষকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে আনে, তার জন্য নতি স্বীকার করায় এবং সৃষ্টি থেকে তাদেরকে ফিরিয়ে এনে আল্লাহ তা'আলার দিকে ধাবিত করে। এ ছাড়াও মুছীবতের মাধ্যমে আরো অনেক স্বার্থ হাসিল হয়। সুতরাং বালা-মুছীবতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা গুনাহ-খাতা ও ভুল-ভ্রান্তি মিটিয়ে দেন। এটি একটি বিরাট নিয়ামত। সুতরাং মুছীবত সমস্ত সৃষ্টির জন্যই বিরাট একটি রহমত ও নিয়ামত। কিন্তু বিপদগ্রস্থ বান্দা বিপদে পড়ে পূর্বের চেয়ে বড় গুনাহয় লিপ্ত হলে বান্দা দীনের দিক থেকে যে ক্ষতির মধ্যে পড়ে, সে কারণে আপদ-বিপদ তার জন্য ক্ষতিকর হয়। কেননা কতক মানুষ বালা- মুছীবতে পড়ে যখন ফকীর হয় অথবা অসুস্থ হয় কিংবা ব্যথিত হয়, তখন সে মুনাফেকী করে, অধৈর্য হয়, তার অন্তর অসুস্থ হয় এবং তার থেকে প্রকাশ্য কুফুরী দেখা দেয়। সেই সঙ্গে সে বেশ কিছু ওয়াজিব আমলও ছেড়ে দেয় এবং এমন কিছু হারাম কাজে লিপ্ত হয়, যা তার দীনকে ক্ষতিগ্রস্থ করে দেয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে মুছীবতের কারণে যে ফলাফল অর্জিত হয়, তা বান্দার জন্য ভালো হয়। বিশেষ করে যখন সে দীনের ব্যাপারে ফিতনায় পড়া থেকে নিরাপদ থাকে। কিন্তু নিছক মুছীবত ভালো নয়; বরং ভালো ফলাফল অর্জিত হওয়ার দিক থেকে ভালো। যেমন মুছীবতে পড়ে কেউ ধৈর্যধারণ করতে পারলে ও আনুগত্যের পথে অগ্রসর হতে পারলে তার জন্য মুছীবত দীনি নেয়ামতে পরিণত হয়। সুতরাং মুছীবত সৃষ্টি করা

যেহেতু আল্লাহর কাজ সে হিসাবে সেটা সমস্ত মাখলুকের জন্য রহমত স্বরূপ। এর কারণে আল্লাহ তা‘আলা প্রশংসিত হন। বালা- মুছীবতে পড়ে যে ধৈর্য ধারণ করতে পারে, তার জন্য তা দীনি নেয়ামতে পরিণত হয়। বালা-মুছীবত তার গুনাহর কাফফারা হওয়ার সাথে সাথে সেটা রহমত স্বরূপ হয় এবং আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হতে সে প্রশংসার পাত্র হয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾

‘‘তারা সে সমস্ত লোক, যাদের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে এবং এসব লোকই হিদায়াতপ্রাপ্ত’’। (সূরা আল বাকারা: ১৫৭)

সুতরাং মুছীবত গুনাহ মাফের কারণ এবং বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধির মাধ্যম। যেসব ক্ষেত্রে সবর করা ওয়াজিব সেসব ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করে তার জন্য উপরোক্ত ফযীলত অর্জিত হয়। পৃথিবীতে বালা- মুছীবত ও আপদ-বিপদ প্রেরণের পিছনে আল্লাহ তা‘আলার হিকমত হলো এগুলোর মাধ্যমে বান্দাদেরকে পরীক্ষা করা। তিনি দেখতে চান কে সবর করে এবং সন্তুষ্ট থাকে আর কে অসন্তুষ্ট হয় এবং বিরক্তি প্রকাশ করে।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلاَءِ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلاَهُمْ فَمَنْ رَضِىَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ

‘‘পরীক্ষা যত কঠিন হয়, পুরস্কারও তত বড় হয়। আল্লাহ তা‘আলা যখন কোনো জাতিকে ভালোবাসেন, তখন তিনি তাদেরকে পরীক্ষা করেন। এতে যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট থাকে, তার জন্য রয়েছে সন্তুষ্টি। আর যে ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হয়, তার প্রতিও রয়েছে অসন্তুষ্টি’’। ইমাম তিরমিযী রহি. হাদীছটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি হাসান বলেছেন। মুছীবতে পড়ে সন্তুষ্ট থাকার অর্থ হলো বান্দা তার ব্যাপারটি আল্লাহর নিকট সোপর্দ করবে, আল্লাহর প্রতি ভালো ধারণা পোষণ করবে এবং তার নিকট ছাওয়াব কামনা করবে। আর তাতে অসন্তুষ্ট হওয়ার অর্থ হলো কোনো জিনিসকে অপছন্দ করা এবং

তাতে সন্তুষ্ট না থাকা। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা‘আলার ব্যবস্থা ও পরিচালনাধীন কোনো জিনিষের প্রতি অসন্তুষ্ট হলো, তার জন্য আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হতে অসন্তুষ্টি রয়েছে।

এ হাদীছে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, বান্দার কর্ম যেমন হয়, ফলাফল তেমনই হয়ে থাকে। এতে আরো প্রমাণ পাওয়া যায় যে, আল্লাহ সুবহানাহু তা‘আলার জন্য শোভনীয় পদ্ধতিতে অন্যান্য ছিফাতের মতই সন্তুষ্ট হওয়া বিশেষণ সাব্যস্ত। এখান থেকে বালা-মুছীবত ও আপদ-বিপদ আসার পিছনে আল্লাহ তা‘আলার হিকমত থাকার কথাও জানা গেল। সে সঙ্গে ক্বদ্বা ও ক্বদর তথা আল্লাহ তা‘আলার নির্ধারণ এবং ফায়ছালার কথাও জানা গেলো। তার নির্ধারণ অনুপাতেই বিপদ-আপদ ও মুছীবত আসে। মুছীবতের সময় সবর করা, আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়া, এবং তার উপর ভরসা করা আবশ্যক। মোটকথা সমস্ত বিপর্যয়, দুর্ঘটনা ও অপ্রীতিকর বিষয় প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে কেবল আল্লাহর উপরই ভরসা করা আবশ্যক। পার্থিব জীবনে মানুষ যেসব দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হয়, তাতে আল্লাহ তা‘আলা সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করার আদেশ করেছেন। কেননা এর পিছনে শুভ পরিণাম রয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি সাহায্য ও সমর্থনের মাধ্যমে ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾

‘‘হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন’’। (সূরা বাকারা: ১৫৩)

এ রকম আরো দলীল রয়েছে, যাতে সবরের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। মুমিন বান্দার রয়েছে এর বিশেষ প্রয়োজন। কেননা সবর মুমিনের আকীদাকে শক্তিশালী করে। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে সবর করা এবং আখিরাতে ছাওয়াবের উদ্দেশ্যে আমল করার তাওফীক দেন।

সবরকারীদের জন্য আল্লাহর পুরস্কার

সবর বা ধৈর্য এমন একটি মানবিক গুণ। এর অনুশীলন ছাড়া জীবনে সাফল্য অর্জন করা যায় না। মুমিনের জীবনে ধৈর্য এক অনিবার্য বস্তবতা। অবশ্য অর্জনীয় এক বিষয়।

আরবিতে ধৈর্য শব্দটি ‘সবর’ হিসেবে পরিচিত। পবিত্র কোরআনে প্রায় ৯০টি স্থানে শব্দটির এসেছে। সবর হচ্ছে, বিপদাপদে নিজকে স্থির রাখা ও আল্লাহর তাআলার ফায়সালার ওপর সন্তষ্ট থাকা।
পবিত্র কোরআনে পার্থিব জীবনে ধৈর্য ধারণকারীদের সুসংবাদ দিতে বলা হয়েছে।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, ‘আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব কিছু ভয় (কখনো) ক্ষুধা, প্রাণ ও সম্পদ, ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দিয়ে। সুসংবাদ শোনাও তাদের যারা ধৈর্য ধারণ করে। যারা তাদের কোনো বিপদের সময় বলে, আমরা সবাই আল্লাহর এবং আমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।’ (সুরা বাকারা, আয়াত: ১৫৫-১৫৬)

ধৈর্য ধারণকারীদের জন্য আল্লাহর সাহায্য

বিপদাপদে ধৈর্য ধারণকারীদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

ইরশাদ হয়েছে, ‘হে মুমিনরা, তোমরা ধৈর্য ও নাাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্য ধারণকারীদের সঙ্গে আছেন। (সুরা বাকারা, আয়াত: ১৫৩)

ধৈর্য ধারণকারীদের জন্য পুরস্কার

পবিত্র কোরআনে ধৈর্য ধারণকারীদের জন্য মহান আল্লাহ বিভিন্ন পুরস্কারের কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন, ‘তোমাদের কাছে যা কিছু আছে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর আল্লাহর কাছে যা আছে তা স্থায়ী।

যারা ধৈর্য ধারণ করে আমি তাদের কাজ অনুযায়ী অবশ্যই প্রতিদান দেব। (সুরা নাহল, আয়াত: ৯৬)

ধৈর্য ধারণের উপায়হাদিস শরিফে ধৈর্য ধারণে উৎসাহিত করা হয়েছে। এক হাদিসে এসেছে, একবার কিছু আনসার সাহাবি নবী (সা.)-এর কাছে সাহায্য চাইলেন। তাদের যে যাই চাইলেন, তিনি তাই দিলেন। এক পর্যায়ে তাঁর কাছে যা ছিল তা শেষ হয়ে যায়। সবকিছু দান করার পর তিনি বললেন, আমার কাছে যা কিছু থাকে তা থেকে আমি কিছুই সঞ্চয় করি না। অবশ্য যে ব্যক্তি নিজেকে অন্যের কাছে চাওয়া থেকে পরিত্রাণ চায় আল্লাহ তাঁকে তা দান করেন। আর যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণের চেষ্টা করে তিনি তাকে ধৈর্য দান করেন। আর যে অমুখাপেক্ষী হতে চায়, আল্লাহ তাকে অভাবমুক্ত রাখেন। ধৈর্যের চেয়ে বেশি প্রশস্ত ও কল্যাণকর কিছু কখনো তোমাদের দেওয়া হবে না।(বুখারি, হাদিস : ৬৪৭০)

উল্লিখিত আয়াত ও হাদিস থেকে বোঝা যায়, সবর বা ধৈর্যের গুণটি অর্জনের জন্য নিজের প্রচেষ্টা থাকতে হবে। পাশাপাশি মহান আল্লাহর কাছে তা চাইতে হবে। এরমাধ্যমে ইহকালের সাফল্য ও রহমত থেকে শুরু করে পরকালের শান্তি ও সুখের নিশ্চয়তা রয়েছে।

দুনিয়াতে মানুষের বিপদাপদ আসা স্বাভাবিক। তাই কোনো কিছু না পেলে বা বিপদে পড়লে ধৈর্যহারা হওয়া অনুচিত। বরং মহান আল্লাহর সাহায্য চাওয়া উচিত। কারণ আমরা জানি না, কোন জিনিস আমাদের জন্য ভালো এবং আর কোন জিনিস মন্দ। তাই রাসুল (সা.) সবর বা ধৈর্যকে সবকিছুর আলো হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন, ‘সবর বা ধৈর্য হলো আলো।’ (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস ২২৯০২)

অর্থাৎ সবর বা ধৈর্য জীবনের সবক্ষেত্রকে আলোকিত করে। তাই জীবনকে রাঙাতে আলোর ছোঁয়া পেতে অবশ্যই সবর অবলম্বন করা উচিত।

সবর একটি মহৎ গুণ

মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব। মানুষ কখনো বিচ্ছিন্নভাবে একা বসবাস করতে পারে না। সমাজবদ্ধভাবে থাকতে গেলে ক্ষমা, দয়া-মায়া ও ভালোবাসা থাকতে হয়। সমাজে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সহাবস্থানের জন্য সহনশীলতা ও সবর তথা ধৈর্য গুণটি অপরিহার্য।

একজন প্রকৃত মানুষের মাঝে যে বিশেষ গুণাবলি থাকা প্রয়োজন 'সবর তথা ধৈর্য' তার মধ্যে অন্যতম। সবর একজন শক্তিশালী মনের মানুষের প্রধান গুণ। ধৈর্য গুণটি মানুষকে সব বিপদ আর দূরাবস্থার মধ্যে আশা করার শক্তি যোগায়। যার মাঝে ধৈর্যের অভাব রয়েছে, সে আসলে পাপিষ্ঠ শয়তানের দলভুক্ত। কারণ, হাদীসের ভাষ্যমতে, 'তাড়াহুড়া শয়তানের কাজ'। একজন মানুষের ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করার ক্ষমতা তার সামনে থেকে যে কোনো বাধাকে অপসারণ করতে পারে। যে কোনো কঠিন কাজকে সহজতর করে দেয় এই মহৎ গুণটি। ধৈর্য বা সবরের প্রয়োজনীয়তা বুঝার জন্য মহান রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনের অসংখ্য জায়গায় অগণিত আয়াত নাযিল করেছেন। সূরা আল-ইমরানের ২০০ নং আয়াতে মুমিনদেরকে ধৈর্য ধারণ ও ধৈর্যের প্রতিযোগিতা করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন, 'হে ইমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ করো, ধৈর্যের প্রতিযোগিতা করো এবং সুসম্পর্ক স্থাপনে আত্মনিয়ন্ত্রণের সংগ্রামে অবিচল থাক, আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা সফল হতে পারো।'
ধৈর্যের গুরুত্ব সম্পর্কে সূরা আসরে আল্লাহ বলেন, 'মহাকালের শপথ, মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু তারা নয়, যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ধৈর্যের উপদেশ দেয়।' (আয়াত: ১-৩)। এই সূরার শেষে ধৈর্যকে সাফল্যের নিয়ামকরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ বলেন, 'আমি (আল্লাহ) যখন আমার মুমিন বান্দার কোনো আপনজনকে মৃত্যু দিই, আর সে সবর করে, তখন আমার কাছে তার একমাত্র প্রতিদান হলো জান্নাত।' (বুখারি)।

ধৈর্যশীলতা একটি কল্যাণকর গুণ। এই গুণটি অর্জন করার জন্য প্রয়োজন প্রবল ইচ্ছাশক্তির। তার সঙ্গে প্রয়োজন দৃঢ় ঈমান ও খালেস তাওয়াক্কুল। রাসূলুল্লাহ সা. একবার আনসারদের কিছু লোককে বললেন, 'আর যে ব্যক্তি ধৈর্য ধরে তিনি (আল্লাহ)

তাকে ধৈর্যশীলই রাখেন। আর যে অমুখাপেক্ষী হতে চায়, আল্লাহ তাকে অভাবমুক্ত রাখেন। ধৈর্যের চেয়ে বেশি প্রশস্ত ও কল্যাণকর কিছু কখনো তোমাদের দান করা হবে না।' (বুখারি)।

ধৈর্য বা সবর শব্দের প্রকৃত অর্থ হলো কোনো উদ্দেশ্য অর্জন করতে অটলভাবে সমস্ত কিছু সহ্য করা। যে কোনো ধরনের বাধা-বিপত্তি, কষ্ট-যন্ত্রণায় হতাশ না হয়ে সুদৃঢ় থেকে সার্বিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। একাগ্রচিত্তে লক্ষ্যে অবিচল থাকাই হলো সবর। ধৈর্য বা সবর ইসলামের সৌন্দর্য। মানব চরিত্রের উত্তম গুণাবলির অন্যতম হলো সবর বা ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা। পবিত্র কোরআনে স্থানে স্থানে মহান আল্লাহ নিজেকে ধৈর্যশীল ও পরম সহিষ্ণু হিসেবে পরিচয় প্রদান করেছেন। বলেন, 'এবং আল্লাহই তো সম্যক প্রজ্ঞাময়, পরম সহনশীল।' (সূরা হজ, আয়াত: ৫৯)।

মানুষের ধৈর্য শক্তি বৃদ্ধির পেছনে ধর্মীয় জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভ‚মিকা রাখে। মহান রাব্বে কারীমের পক্ষ থেকে মানবজীবনে আপতিত বিপদাপদ ও বালা-মুসিবত মানুষের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। মহান আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত কোরআন মাজিদে বলেন, 'আমি তোমাদিগকে অবশ্যই পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধনসম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা। তুমি শুভ সংবাদ দাও ধৈর্যশীলগণকে যারা তাদের ওপর বিপদ আপতিত হলে বলে, 'আমরা তো আল্লাহরই এবং নিশ্চিতভাবে তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী।' (সূরা বাকারা : আয়াত ১৫৫-১৫৭)।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, মানবতার অগ্রদূত বিশ্বনবী হুযূর পাক (সা.) হলেন ধৈর্যের মূর্ত প্রতীক। নবুয়াত প্রাপ্তির পর যখন তিনি ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করলেন ঠিক তখনই জ্বলে উঠলো কাফেরদের জুলুম-অত্যাচার, ঠাট্টা-বিদ্রুপ, শারীরিক নির্যাতনের লেলিহান শিখা। শিষ্যদের ওপর নেমে আসে পৈশাচিক নির্যাতনের স্টিম রোলার, অনেকে শহীদও হয়েছেন। তিনি ও তাঁর পরিবারকে বয়কটের মতো দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে। তায়েফে আঘাতে আঘাতে রক্তাক্ত হয়েছেন। এমন কোনো নিপীড়ন নেই যা মক্কী জীবনের ১৩ বছরে তাঁর উপরে চালানো হয়নি। শেষ পর্যন্ত নিজ জন্মভ‚মি থেকে হিজরত করেছেন। কিন্তু এক মহূর্তের জন্যও ধৈর্যচ্যুত হননি। কর্তব্য পালন করে গেছেন অটল অবিচল থেকে, পরম নিষ্ঠার সাথে। মদিনা হিজরতের পরেও

তাঁর ওপর যুদ্ধের পর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে মক্কার কাফের-মুশরিকরা। তিনি পরম ধৈর্যের সাথে তার মোকাবিলা করেছেন। এর ফলশ্রæতিতে অবশেষে এসেছে ফতহে মুবিন-মক্কা বিজয়।

মহান আল্লাহ তায়া'লা তাঁর প্রিয় হাবীব (সা.) কে সবরের নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'হে নবী! সেভাবে ধৈর্য অবলম্বন করুন, যেভাবে উচ্চ সংকল্প সম্পন্ন রাসূলগণ করেছেন। আর এই লোকদের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না।' (সূরা আহকাফ : আয়াত ৩৫) অন্যত্র এরশাদ হয়েছে, 'হে মুহাম্মদ! সা. আপনার পূর্বেও অসংখ্য রাসূলকে অমান্য করা হয়েছে। কিন্তু এই অস্বীকৃতি ও যাবতীয় জ্বালাতন নির্যাতনের মোকাবেলায় তাঁরা ধৈর্য অবলম্বন করেছেন। অবশেষে তাঁদের প্রতি আমার সাহায্য এসে পৌঁছেছে সুতরাং আপনিও ধৈর্য অবলম্বন করুন।' (সূরা আনয়াম : আয়াত ৩৪)।

মানুষ স্বভাবতই সুখে, উল্লাসে আল্লাহকে ডাকে, স্মরণ করে। কিন্তু যখন সীমাহীন কষ্ট, বালা-মুসিবত, বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয় তখন সে ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে সক্ষম কি-না এটাই আল্লাহ তায়া'লা দেখতে চান। এক হাদিসে রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, 'আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে বিপদে আক্রান্ত করেন।' (বুখারি)।

অন্য হাদিসে আরও স্পষ্টভাবে এরশাদ করেন, 'আল্লাহ যখন তাঁর বান্দার কল্যাণ চান তখন দুনিয়াতে তার শাস্তি ত্বরান্বিত করেন, আর যখন কোনো বান্দার অকল্যাণ চান তখন তার পাপগুলো রেখে দিয়ে কিয়ামতের দিন তার প্রাপ্য পূর্ণ করে দেন।' (তিরমিজি)।

সবর হলো নূর

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবর বা ধৈর্যকে আলো সাব্যস্ত করেছেন। ইরশাদ হয়েছে,

الصَّبْرُ ضِيَاءٌ.

“সবর ও ধৈর্য হলো আলো।”মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২২৯০২

অর্থাৎ সবর ও ধৈর্য জীবনকে আলোকিত করে। জীবনের সকল অঙ্গনকে করে দেয় দ্যুতিময়। তাই জীবনকে রাঙাতে, জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে আলোর ছোঁয়া পেতে আমাদেরকে অবশ্যই সবর অবলম্বন করতে হবে।

সর্বাধিক কষ্টসাধ্য ধৈর্য

বস্তুত ধৈর্যের কষ্ট ও আনন্দ নির্ভর করে ব্যক্তির সক্ষমতা ও সংকল্পের উপর। এ কারনেই কোনো কাজ করা বা না করার ব্যাপারে যদি মানুষের সক্ষমতা ও সংকল্প থাকে, তবে সেক্ষেত্রে তার জন্য ধৈর্যধারণ সর্বাধিক কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। কারণ কাজটি অকল্যাণকর হলে তার অভ্যন্তরীণ নেতিবাচক শক্তিটি ওই কাজটিই করতে চাইবে। আর ইতিবাচক শক্তিটি তাকে বিরত রাখার চেষ্টা করবে। দ্বৈত শক্তির এই টানাপোড়েন ও জয় পরাজয়ের মধ্যে দিয়েই মূলত তার ধৈর্য ও অধৈর্যের বিষয়টি নিরুপিত হবে।

পক্ষান্তরে তার মধ্যে যদি সক্ষমতা ও সংকল্পের কোনো গুণই না থাকে তবে তার জন্য ধৈর্যধারণ করা এবং যেকোনো বিষয়ের ইতিবাচকতা অথবা নেতিবাচকতা এড়িয়ে চলা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। আর যদি তার মধ্যে কেবল একটি গুণ থাকে তবে তার জন্য একদিক থেকে ধৈর্যধারণ সহজ হলেও অন্যদিক থেকে কঠিন হয়।

সংকল্প ও সক্ষমতা সত্তেও যারা অন্যায় ও অপকর্ম থেকে বিরত থাকে এবং প্রবৃত্তির চাহিদার বিরুদ্ধে ধৈর্যধারণ করে, নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি হাদিসে তাদেরকে আরশের ছায়াতলে আশ্রয় পাওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন এবং তাদেরকে সাতটি শ্রেণিতে বিভক্ত করে তাদের ধৈর্যের ধরন ব্যাখ্যা করেছেন। এই সাত শ্রেণির মধ্যে রয়েছেন___

এক. ন্যায়পরায়ণ শাসক ---- যে নিজের মত ও স্বার্থের বিপরীতে গিয়েও ইনসাফের ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

দুই. সংযমী যুবক ---- যে প্রবৃত্তি ও কুবাসনার লাগাম টেনে ধরে অসম ধৈর্যের সাথে আল্লাহর ইবাদাতে নিমগ্ন থাকে।

তিন. আল্লাহর নৈকট্যপ্রিয় সুপুরুষ ---- যে নিয়মিত মসজিদে যাতায়াত করে এবং ধৈর্য ও তৃপ্তি সহকারে মহান আল্লাহর ইবাদাত করে।

চার. গোপনে দানকারী ----- যে একান্ত আপন ও কাছের মানুষটি থেকেও তার দানের ব্যাপারটি গোপন রাখে।

পাঁচ. ব্যভিচারের প্রতি অনাগ্রহী সজ্জন ব্যক্তি ---- যে কুলীন ও সম্ভ্রান্ত বংশের সুন্দরী নারীর প্ররোচনা উপেক্ষা করে ধৈর্যধারণ করে।

ছয়. আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রত্যাশী দুই ব্যক্তি ---- যারা কেবল আলাহর ভালোবাসা পাওয়ার জন্য পরস্পরের কাছে আসে অথবা দূরে সরে যায়।

সাত. খোদাভীরু ---- যে আল্লাহর ভয়ে নীরবে নিভৃতে একাকি কাঁদে এবং কারো উপস্থিতি টের পেলে অশ্রু মুছে ফেলে।

উপর্যুক্ত সাতশ্রেণির প্রত্যেকেই তাদের চাহিদা ও সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও অসামান্য ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে। নিজেদের প্রবৃত্তি ও কামনা বাসনার উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছে।

তাদের এই কষ্টসাধ্য ধৈর্যের কারণেই আল্লাহর রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে এই শুভ পরিণতি ও অনন্য মর্যাদার সুসংবাদ প্রদান করেছেন।

ধৈর্যধারণ জগতে সম্মানিত হওয়ার পথ

ধৈর্যই মানুষকে এই জগত সংসারে সংসারি বানিয়ে দেয়। ধৈর্যশীল কখনো কারো সামনে নিজের মাথা নত করে না। ধৈর্যের ফলে সে অন্য কারো জিনিসের প্রতি লোভী হয়না বরং নিজের যা আছে তার উপরই সন্তুষ্ট হয় এবং ধৈর্যধারণ করে।

ইয়ারমুক যুদ্ধে আবুল আওয়ার মুসলমানদের ডেকে বললেন ---- হে কুরাইশ গোত্র! তোমরা তোমাদের প্রতিদান ও ধৈর্যের অংশকে গ্রহণ করো। কেননা ধৈর্যই হলো দুনিয়ায় বড় সম্মান ও আখিরাতে রহমত ও ফজিলত। তাই ধৈর্যধারণ করো, অধৈর্য হয়ো না। সালিম কত সুন্দর করে কবিতা আবৃত্তি করেছেন --

গলেতে আমি পরেছি সবরে জামিলের মালা,
প্রভু আমাকে রেখেছেন হেফাজত সব বখিলদের বালা।

জগতের মুসিবতের উপর ধৈর্য

এ ক্ষনস্থায়ী মুসাফিরখানায় কষ্ট-ক্লেশ ছাড়া কেউ কখনো সফলতার উচু পাহাড়ে উঠতে পারেনি, আর কেউ পারবেও না। আসলে দুঃখের পরেই সুখ আসে। তবে তার এই দু:খ ও কষ্টটা সারাজীবন তার গলাতেই ঝুলে থাকবে এমনটা নয়; বরং কিছুদিন মালিকের পক্ষ থেকে বান্দার উপর পরীক্ষামূলক থাকবে এবং বান্দা পরীক্ষায় পাশ করলেই আল্লাহ আবার উঠিয়ে নিবেন। আল্লাহ তায়া’লা ইরশাদ করেন -

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِىْ كَبَدٍؕ

অর্থাৎ আমি তো মানুষ সৃষ্টি করেছি কষ্ট ক্লেশের মধ্যে। (সূরা বালাদ, আয়াত নম্বরঃ ৪)

জীবনে দুঃখ আসবে। তাই সেই দু:খের মাঝে ঘাবড়ানো যাবে না।ধৈর্যধারণ করতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার প্রতি আস্থা রাখতে হবে এই বলে যে এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা। আল্লাহ তায়া'লা মু'মিনিদের বিভিন্ন দুঃখ ও কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করার আদেশ করেন --

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَىْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِؕ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَۙ

আমি তোমাদেরকে কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা অবশ্যই পরীক্ষা করিব। তুমি শুভ সংবাদ দাও ধৈর্যশীলগণকে।(সূরা বাক্কারা, আয়াত নম্বরঃ ১৫৫)

রবের কাছে দোয়ার মাধ্যমে ধৈর্যধারণ

আজকাল মানুষেরা দুয়ার উপর ধৈর্যধারণ করতে অধৈর্য হয়ে পড়েছে। অথচ দুয়ার উপর ধৈর্যধারণ করা হলো ধৈর্যের বিশেষ ক্ষেত্র। তাইতো দ্বীন থেকে তারা ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। আর এ দূরত্ব তাকে অনেক বড় গুনাহ ও পাপ করতে বাধা দেয়না।

হযরত নূহ (আঃ) প্রায় সাড়ে নয়শত বছর দু:খ কষ্ট সহ্য করেছেন। তবুও তিনি মালিকের দরবারে শুধু দুয়া করতেন ও ধৈর্যধারণ করতেন। তিনি অধৈর্য হয়ে দুয়া করা ছেড়ে দেননি। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে ---

قَالَ رَبِّ اِنِّىْ دَعَوْتُ قَوْمِىْ لَيْلًا وَّنَهَارًاۙ

فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَآءِيْٓ اِلَّا فِرَارً

সে বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রতিপালক ! আমি তো আমার সম্প্রদায়কে দিবারাত্রি আহবান করিয়াছি,'কিন্তু আমার আহবান উহাদের পলায়ন প্রবণতাই বৃদ্ধি করিয়াছে। (সুরা নূহ, ৫-৬)

দুয়ার ক্ষেত্রে কষ্ট কেবল দেহে নয় বরং মনেও ধৈর্যধারণ করবে অর্থাৎ মনে কোনো আক্ষেপ করবেনা। আর শত্রুর পক্ষ থেকে যত বদদুয়া আসুক না কেনো তাতেও কোনো পরোয়া করবেনা। তখনও মুমিন বান্দা ধৈর্য হারাবেন না। আল্লাহ তায়া'লা ইরশাদ করেন ---

لَـتُبْلَوُنَّ فِيْٓ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَلَـتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا اَذًى كَثِيْـرًا ۭ وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ

তোমাদেরকে নিশ্চয়ই তোমাদের ধনৈশ্বর্য ও জীবন সম্বন্ধে পরীক্ষা করা হইবে। তোমাদের পূর্বে যাহাদেরকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহাদের এবং মুশরিকদের নিকট হইতে তোমরা অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনিবে। যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং তাক্ওয়া অবলম্বন কর তবে নিশ্চয়ই উহা হইবে দৃঢ় সংকল্পের কাজ। (সূরা আলে ইমরান, ১৮৬)

পবিত্র কুরআনুল কারিমে আরো ইরশাদ হয়েছে ---

وَاصْبِرْ عَلٰی مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا

লোকে যাহা বলে, তাহাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং সৌজন্য সহকারে উহাদেরকে পরিহার করিয়া চল। (সূরা মুযযাম্মিল, ১০)

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰی مَا كُذِّبُوْا وَاُوْذُوْا حَتّٰٓى اَتٰىهُمْ نَصْرُنَا ۚ

তোমার পূর্বেও অনেক রাসূলকে অবশ্যই মিথ্যাবাদী বলা হইয়াছিল ; কিন্তু তাহাদেরকে মিথ্যাবাদী বলা ও ক্লেশ দেওয়া সত্ত্বেও তাহারা ধৈর্য ধারণ করিয়াছিল যে পর্যন্ত না আমার সাহায্য তাহাদের নিকট আসিয়াছে। (সুরা আল আনআম, ৩৪)

আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি আসা পর্যন্ত দুয়াকে চালু রাখবেন, দুয়াকে বন্ধ করে দিবেন না। সাহায্য আসার প্রহর গুণেই ধৈর্যধারণ করবেন। আল্লাহ তায়া'লা ইরশাদ করেন --

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَآءُ وَالضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ اَلَآ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ

তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করিবে-যদিও এখনও তোমাদের নিকট তোমাদের পূর্ববর্তীদের অনুরূপ অবস্থা আসে নাই ? অর্থ-সংকট ও দুঃখ-ক্লেশ তাহাদেরকে স্পর্শ করিয়াছিল এবং তাহারা ভীত ও কম্পিত হইয়াছিল। এমনকি রাসূল এবং তাঁহার সঙ্গে ঈমান আনয়নকারিগণ বলিয়া উঠিয়াছিল, 'আল্লাহ্‌র সাহায্য কখন আসিবে?' জানিয়া রাখ, অবশ্যই আল্লাহ্‌র সাহায্য নিকটে। (সূরা বাক্বারাহ, ২১৪)

হৃদয়ে এই বিশ্বাস স্থাপন করতেই হবে যে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য আসবেই। আল্লাহ তায়া'লা ইরশাদ করেন ---

حَتّٰى اِذَا اسْتَيْـَٔسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا جَآءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّىَ مَنْ نَّشَآءُ وَلَا يُرَدُّ بَاْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ

অবশেষে যখন রাসূলগণ নিরাশ হইল এবং লোকে ভাবিল যে, রাসূলগণকে মিথ্যা আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে তখন তাহাদের নিকট আমার সাহায্য আসিল। এইভাবে আমি যাহাকে ইচ্ছা করি সে উদ্ধার পায়। অপরাধী সম্প্রদায় হইতে আমার শাস্তি রদ করা যায় না।
(সূরা ইউসুফ, ১১০)

যে মুমিন বান্দা সত্যের উপর থাকবে ও সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করবে তখন তার কষ্ট সহ্য করতেই হবে। আর এই কষ্ট ক্লেশের ঔষধ একমাত্র ধৈর্যধারণ। অধৈর্য না হয়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা ও তার দরবারের দিকে ফিরে যাওয়া।

তালিবে ইলমের জীবনে ধৈর্যধারণ

তালিবে ইলম জীবনে ধৈর্যধারণ করা হলো ধৈর্যের বড় ক্ষেত্র। ইলমে দ্বীন অর্জন করতে হলে বুকে থাকতে হবে ধৈর্যের পাহাড়, হতে হবে ইস্পাত লোহার মতো দৃঢ় ও শক্ত। অসীম দুঃখ বেদনাকে বুকে লালন করেই হতে হবে অনেক বড়। ছুতে হবে ইলমের হিমালয়। পৌছতে হবে কাঙ্ক্ষিত মানযিলে। যদি বুকে এমন স্বপ্ন লালন না করা যায়, তাহলে ইলমের ভূবনে কখনোই পৌছানো যাবে না। ফোটা যাবে না ইলমে নববির ফুটন্ত ফুল হয়ে। খিজির (আঃ) মুসা (আঃ) কে ইলম শিক্ষা করতে হলে ধৈর্যধারণের বিষয়ে পূর্বে থেকেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে ---

قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا

وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰى مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا

সে বলিল, আপনি কিছুতেই আমার সঙ্গে ধৈর্য ধারণ করিয়া থাকিতে পারিবেন না,
'যে বিষয় আপনার জ্ঞানায়ত্ত নহে সে বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধারণ করিবেন কেমন করিয়া?' (সুরা কাহফ, ৬৭-৬৮)

উত্তরে মুসা আঃ বললেন, জ্বী আমি ধৈর্যধারণ করতে পারবো। আমি হাজারো কষ্ট বুকে লালন করে আপনার থেকে ইলম শিখব। আমি একটুও অধৈর্য হবো না। আপনি আমাকে ইলম শিক্ষা দিন। পবিত্র কুরআন কারিমে ইরশাদ হয়েছে ---

قَالَ سَتَجِدُنِىٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَّلَآ اَعْصِىْ لَكَ اَمْرًا

মূসা বলিল, 'আল্লাহ্ চাহিলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাইবেন এবং আপনার কোন আদেশ আমি অমান্য করিব না। (সূরা কাহফ, ৬৯)

এ প্রকার ধৈর্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে মুফতি হওয়ার পূর্বে ফতোয়া না দেওয়ার উপর ধৈর্যধারণ করা। আর শিক্ষকেরও ধৈর্যধারণ করতে হবে ছাত্রকে সবক বুঝিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে।

কুরআনের আলোকে সবরের বিভিন্ন আয়াত

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصۡبِرُواْ وَصَابِرُواْ ﴾ [ال عمران : ٢٠٠]

অর্থাৎ “হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং ধৈর্য ধারণে প্রতিযোগিতা কর।” <صلى الله عليه وسلمm>(সূরা আলে ইমরান ২০০ আয়াত)

তিনি আরও বলেন,

﴿وَلَنَبۡلُوَنَّكُم بِشَيۡءٖ مِّنَ ٱلۡخَوۡفِ وَٱلۡجُوعِ وَنَقۡصٖ مِّنَ ٱلۡأَمۡوَٰلِ وَٱلۡأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِۗ وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ ١٥٥﴾ [البقرة : ١٥٥]

অর্থাৎ “নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে কিছু ভয় ও ক্ষুধা দ্বারা এবং কিছু ধনপ্রাণ এবং ফলের (ফসলের) নোকসান দ্বারা পরীক্ষা করব; আর তুমি ধৈর্যশীলদেরকে সুসংবাদ দাও।” <صلى الله عليه وسلمm>(সূরা বাকারাহ ১৫৫ আয়াত)

তিনি আরও বলেন,

﴿إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّٰبِرُونَ أَجۡرَهُم بِغَيۡرِ حِسَابٖ﴾ [الزمر : ١٠]

অর্থাৎ “ধৈর্যশীলদেরকে তো অপরিমিত পুরস্কার দেওয়া হবে।” (সূরা যুমার ১০ আয়াত)

তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنۡ عَزۡمِ ٱلۡأُمُورِ ٤٣ ﴾ [الشورا : ٤٣]

অর্থাৎ “অবশ্যই যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে, নিশ্চয় তা দৃঢ়-সংকল্পের কাজ।” (সূরা শুরা ৪৩ আয়াত)

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ١٥٣ ﴾ [البقرة : ١٥٣]

অর্থাৎ “হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন।” (সূরা বাকারাহ ১৫৩ আয়াত)

তিনি আরো বলেন,

﴿وَلَنَبۡلُوَنَّكُمۡ حَتَّىٰ نَعۡلَمَ ٱلۡمُجَٰهِدِينَ مِنكُمۡ وَٱلصَّٰبِرِينَ وَنَبۡلُوَاْ أَخۡبَارَكُمۡ ٣١ ﴾ [محمد : ٣١]

অর্থাৎ “আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব যতক্ষণ না আমি তোমাদের মধ্যে মুজাহিদ ও ধৈর্যশীলদেরকে জেনে নই এবং আমি তোমাদের অবস্থা পরীক্ষা করি।” <صلى الله عليه وسلمm>(সূরা মুহাম্মাদ ৩১ আয়াত)

আয়াতসমূহে ধৈর্যের আদেশ এবং তার মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে তার সংখ্যা অনেক ও প্রসিদ্ধ।

সবর সংক্রান্ত হাদিস

১.আবূ মালিক হারিস ইবনু 'আসেম আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ''পবিত্রতা অর্ধেক ঈমান। আর 'আলহামদু লিল্লাহ' (কিয়ামতে নেকীর) দাঁড়িপাল্লাকে ভরে দেবে এবং 'সুবহানাল্লাহ' ও 'আলহামদু লিল্লাহ' আসমান ও যমীনের মধ্যস্থিত শূন্যতা পূর্ণ করে দেয়। নামায হচ্ছে জ্যোতি। সাদকাহ হচ্ছে প্রমাণ। ধৈর্য হল আলো। আর কুরআন তোমার স্বপক্ষে অথবা বিপক্ষে দলীল। প্রত্যেক ব্যক্তি সকাল সকাল সবকর্মে বের হয় এবং তার আত্মার ব্যবসা করে। অতঃপর সে তাকে (শাস্তি থেকে) মুক্ত করে অথবা তাকে (আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত ক'রে) বিনাশ করে।''

২. আবূ সায়ীদ সা'দ ইবনু মালিক ইবনু সিনান খুদরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত যে কিছু আনসারী আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে কিছু চাইলেন। তিনি তাদেরকে দিলেন। পুনরায় তারা দাবী করল। ফলে তিনি (আবার) তাদেরকে দিলেন। এমনকি যা কিছু তাঁর কাছে ছিল তা সব নিঃশেষ হয়ে গেল। অতঃপর যখন তিনি সমস্ত জিনিস নিজ হাতে দান করে দিলেন, তখন তিনি বললেন, ''আমার কাছে যা কিছু (মাল) আসে তা আমি তোমাদেরকে না দিয়ে কখনই জমা করে রাখব না। (কিন্তু তোমরা একটি কথা মনে রাখবে) যে ব্যক্তি চাওয়া থেকে পবিত্র থাকার চেষ্টা করবে, আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখবেন। আর যে ব্যক্তি (চাওয়া থেকে) অমুখাপেক্ষিতা অবলম্বন করবে, আল্লাহ তাকে অমুখাপেক্ষী করবেন। যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করার চেষ্টা করবে আল্লাহ তাকে ধৈর্য ধারণের ক্ষমতা প্রদান করবেন। আর কোন ব্যক্তিকে এমন কোন দান দেওয়া হয়নি, যা ধৈর্য অপেক্ষা উত্তম ও বিস্তর হতে পারে।

৩. আবূ ইয়াহয়া সুহাইব ইবনু সিনান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ''মুমিনের ব্যাপারটাই আশ্চর্যজনক। তার প্রতিটি কাজে তার জন্য মঙ্গল রয়েছে। এটা মু'মিন ব্যতীত অন্য কারো জন্য নয়। সুতরাং তার

সুখ এলে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। ফলে এটা তার জন্য মঙ্গলময় হয়। আর দুঃখ পৌঁছলে সে ধৈর্য ধারণ করে। ফলে এটাও তার জন্য মঙ্গলময় হয়।’’

4.সুহাইব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘‘তোমাদের পূর্ব যুগে একজন বাদশাহ ছিল এবং তাঁর (উপদেষ্টা) এক জাদুকর ছিল। জাদুকর বার্ধক্যে উপনীত হলে বাদশাহকে বলল যে, ‘আমি বৃদ্ধ হয়ে গেলাম তাই আপনি আমার নিকট একটি বালক পাঠিয়ে দিন, যাতে আমি তাকে জাদু-বিদ্যা শিক্ষা দিতে পারি।’ ফলে বাদশাহ তার কাছে একটি বালক পাঠাতে আরম্ভ করল, যাকে সে জাদু শিক্ষা দিত। তার যাতায়াত পথে এক পাদ্রী বাস করত। যখনই বালকটি জাদুকরের কাছে যেত, তখনই পাদ্রীর নিকটে কিছুক্ষণের জন্য বসত, তাঁর কথা তাকে ভাল লাগত। ফলে সে যখনই জাদুকরের নিকট যেত, তখনই যাওয়ার সময় সে পাদ্রীর কাছে বসত। যখন সে পাদ্রীর কাছে আসত জাদুকর তাকে (তার বিলম্বের কারণে) মারত। ফলে সে পাদ্রীর নিকটে এর অভিযোগ করল। পাদ্রী বলল, ‘যখন তোমার ভয় হবে যে, জাদুকর তোমাকে মারধর করবে, তখন তুমি বলবে, আমার বাড়ির লোক আমাকে (কোন কাজে) আটকে দিয়েছিল। আর যখন বাড়ির লোকে মারবে বলে আশঙ্কা হবে, তখন তুমি বলবে যে, জাদুকর আমাকে (কোন কাজে) আটকে দিয়েছিল।’

সুতরাং সে এভাবেই দিনপাত করতে থাকল। একদিন বালকটি তার চলার পথে একটি বিরাট (হিংস্র) জন্তু দেখতে পেল। ঐ (জন্তু)টি লোকের পথ অবরোধ করে রেখেছিল। বালকটি (মনে মনে) বলল, ‘আজ আমি জানতে পারব যে, জাদুকর শ্রেষ্ঠ না পাদ্রী?’ অতঃপর সে একটি পাথর নিয়ে বলল, ‘হে আল্লাহ! যদি পাদ্রীর বিষয়টি তোমার নিকটে জাদুকরের বিষয় থেকে পছন্দনীয় হয়, তাহলে তুমি এই পাথর দ্বারা এই জন্তুটিকে মেরে ফেল। যাতে (রাস্তা নিরাপদ হয়) এবং লোকেরা চলাফিরা করতে পারে।’ (এই দো‘আ করে) সে জন্তুটাকে পাথর ছুঁড়ল এবং তাকে হত্যা করে দিল। এর পর লোকেরা চলাফিরা করতে লাগল। বালকটি পাদ্রীর নিকটে এসে ঘটনাটি বর্ণনা করল। পাদ্রী তাকে বলল, ‘বৎস! তুমি আজ আমার চেয়ে উত্তম। তোমার (ঈমান ও একীনের)

ব্যাপার দেখে আমি অনুভব করছি যে, শীঘ্রই তোমাকে পরীক্ষায় ফেলা হবে। সুতরাং যখন তুমি পরীক্ষার সম্মুখীন হবে, তখন তুমি আমার রহস্য প্রকাশ করে দিও না।'

আর বালকটি (আল্লাহর ইচ্ছায়) জন্মান্ধত্ব ও কুষ্ঠরোগ ভাল করত এবং অন্যান্য সমস্ত রোগের চিকিৎসা করত। (এমতাবস্থায়) বাদশাহর জনৈক নিকটী অন্ধ হয়ে গেল। যখন সে বালকটির কথা শুনল, তখন প্রচুর উপঢৌকন নিয়ে তার কাছে এল এবং তাকে বলল যে, 'তুমি যদি আমাকে ভাল করতে পার, তাহলে এ সমস্ত উপঢৌকন তোমার।' সে বলল, 'আমি তো কাউকে আরোগ্য দিতে পারি না, আল্লাহ তা'আলাই আরোগ্য দান করে থাকেন। যদি তুমি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন কর, তাহলে আমি আল্লাহর কাছে দো'আ করব, ফলে তিনি তোমাকে অন্ধত্বমুক্ত করবেন।' সুতরাং সে তার প্রতি ঈমান আনল। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাকে আরোগ্য দান করলেন। তারপর সে পূর্বেকার অভ্যাস অনুযায়ী বাদশাহর কাছে গিয়ে বসল। বাদশাহ তাকে বলল, 'কে তোমাকে চোখ ফিরিয়ে দিল?' সে বলল, 'আমার প্রভু!' সে বলল, 'আমি ব্যতীত তোমার অন্য কেউ প্রভু আছে?' সে বলল, 'আমার প্রভু ও আপনার প্রভু হচ্ছেন আল্লাহ।' বাদশাহ তাকে গ্রেপ্তার করল এবং তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত শাস্তি দিতে থাকল, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে ঐ (চিকিৎসক) বালকের কথা বলে দিল। অতএব তাকে (বাদশার নিকটে) নিয়ে আসা হল। বাদশাহ তাকে বলল, 'বৎস! তোমার কৃতিত্ব ঐ সীমা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে যে, তুমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য দান করছ এবং আরো অনেক কিছু করছ।' বালকটি বলল, 'আমি কাউকে আরোগ্য দান করি না, আরোগ্য দানকারী হচ্ছেন একমাত্র মহান আল্লাহ।' বাদশাহ তাকেও গ্রেপ্তার করে ততক্ষণ পর্যন্ত শাস্তি দিতে থাকল, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে ঐ পাদ্রীর কথা বলে দিল।

অতঃপর পাদ্রীকেও (তার কাছে) নিয়ে আসা হল। পাদ্রীকে বলা হল যে, 'তুমি নিজের ধর্ম থেকে ফিরে যাও।' কিন্তু সে অস্বীকার করল। ফলে তার মাথার সিঁথিতে করাত রাখা হল। করাতটি তাকে (চিরে) দ্বিখন্ডিত করে দিল; এমনকি তার দুই ধার (মাটিতে) পড়ে গেল। তারপর বাদশাহর নিকটীকে নিয়ে আসা হল এবং তাকে বলা হল যে, 'তোমার ধর্ম পরিত্যাগ কর।' কিন্তু সেও (বাদশার কথা) প্রত্যাখান করল। ফলে তার মাথার সিঁথিতে করাত রাখা হল। তা দিয়ে তাকে (চিরে) দ্বিখন্ডিত করে দিল; এমনকি তার দুই ধার (মাটিতে) পড়ে গেল। তারপর বালকটিকে নিয়ে আসা হল। অতঃপর

তাকে বলা হল যে, ‘তুমি ধর্ম থেকে ফিরে এস।’ কিন্তু সেও অসম্মতি জানাল। সুতরাং বাদশাহ তাকে তার কিছু বিশেষ লোকের হাতে সঁপে দিয়ে বলল যে, ‘একে অমুক পাহাড়ে নিয়ে যাও, তার উপরে তাকে আরোহণ করাও। অতঃপর যখন তোমরা তার চূড়ায় পৌঁছবে (তখন তাকে ধর্ম-ত্যাগের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা কর) যদি সে নিজের ধর্ম থেকে ফিরে যায়, তাহলে ভাল। নচেৎ তাকে ওখান থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দাও।’ সুতরাং তারা তাকে নিয়ে গিয়ে পাহাড়ের উপর আরোহণ করল। বালকটি আল্লাহর কাছে দো‘আ করল, ‘হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য তাদের মুকাবেলায় যে ভাবেই চাও যথেষ্ট হয়ে যাও।’ সুতরাং পাহাড় কেঁপে উঠল এবং তারা সকলেই নীচে পড়ে গেল।

বালকটি হেঁটে বাদশার কাছে উপস্থিত হল। বাদশাহ তাকে জিজ্ঞাসা করল, ‘তোমার সঙ্গীদের কি হল?’ বালকটি বলল, ‘আল্লাহ তা‘আলা তাদের মোকাবেলায় আমার জন্য যথেষ্ট হয়েছেন।’

বাদশাহ আবার তাকে তার কিছু বিশেষ লোকের হাতে সঁপে দিয়ে বলল যে, ‘একে নিয়ে তোমরা নৌকায় চড় এবং সমুদ্রের মধ্যস্থলে গিয়ে তাকে ধর্মের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা কর! যদি সে স্বধর্ম থেকে ফিরে আসে, তাহলে ঠিক আছে। নচেৎ তাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ কর।’ সুতরাং তারা তাকে নিয়ে গেল। অতঃপর বালকটি (নৌকায় চড়ে) দো‘আ করল, ‘হে আল্লাহ! তুমি এদের মোকাবেলায় যেভাবে চাও আমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাও।’ সুতরাং নৌকা উল্টে গেল এবং তারা সকলেই পানিতে ডুবে গেল।

তারপর বালকটি হেঁটে বাদশাহর কাছে এল। বাদশাহ বলল, ‘তোমার সঙ্গীদের কী হল?’ বালকটি বলল, ‘আল্লাহ তা‘আলা তাদের মোকাবেলায় আমার জন্য যথেষ্ট হয়ে গেছেন।’ পুনরায় বালকটি বাদশাহকে বলল যে, ‘আপনি আমাকে সে পর্যন্ত হত্যা করতে পারবেন না, যে পর্যন্ত না আপনি আমার নির্দেশিত পদ্ধতি অবলম্বন করবেন।’ বাদশাহ বলল, ‘তা কী?’ সে বলল, ‘আপনি একটি মাঠে লোকজন একত্রিত করুন এবং গাছের গুড়িতে আমাকে ঝুলিয়ে দিন। অতঃপর আমার তূণ থেকে একটি তীর নিয়ে তা ধনুকের মাঝে রাখুন, তারপর বলুন, ‘‘বিসমিল্লাহি রাব্বিল গুলাম!’’ (অর্থাৎ এই বালকের প্রতিপালক আল্লাহর নামে মারছি।) অতঃপর আমাকে তীর মারুন। এভাবে করলে আপনি আমাকে হত্যা করতে সফল হবেন।’

সুতরাং (বালকটির নির্দেশানুযায়ী) বাদশাহ একটি মাঠে লোকজন একত্রিত করল এবং গাছের গুঁড়িতে তাকে ঝুলিয়ে দিল। অতঃপর তার তূণ থেকে একটি তীর নিয়ে তা ধনুকের মাঝে রেখে বলল, 'বিসমিল্লাহি রাব্বিল গুলাম!' (অর্থাৎ এই বালকের প্রতিপালক আল্লাহর নামে মারছি।) অতঃপর তাকে তীর মারল। তীরটি তার কান ও মাথার মধ্যবর্তী স্থানে (কানমুতোয়) লাগল। বালকটি তার কানমুতোয় হাত রেখে মারা গেল। অতঃপর লোকেরা (বালকটির অলোকিকতা দেখে) বলল যে, 'আমরা এ বালকটির প্রভুর উপর ঈমান আনলাম।' বাদশার কাছে এসে বলা হল যে, 'আপনি যার ভয় করছিলেন তাই ঘটে গেছে, লোকেরা (আল্লাহর প্রতি) ঈমান এনেছে।' সুতরাং সে পথের দুয়ারে গর্ত খুঁড়ার আদেশ দিল। ফলে তা খুঁড়া হল এবং তাতে আগুন জ্বালানো হল। বাদশাহ আদেশ করল যে, 'যে দ্বীন থেকে না ফিরবে তাকে এই আগুনে নিক্ষেপ কর' অথবা তাকে বলা হল যে, 'তুমি আগুনে প্রবেশ কর।' তারা তাই করল। শেষ পর্যন্ত একটি স্ত্রীলোক এল। তার সঙ্গে তার একটি শিশু ছিল। সে তাতে পতিত হতে কুণ্ঠিত হলে তার বালকটি বলল, 'আম্মা! তুমি সবর কর। কেননা, তুমি সত্যের উপরে আছ।'

5.আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি মহিলার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। সে একটি কবরের পাশে বসে কাঁদছিল। তিনি বললেন, ''তুমি আল্লাহকে ভয় কর এবং ধৈর্য ধারণ কর।'' সে বলল, 'আপনি আমার নিকট হতে দূরে সরে যান। কারণ, আমি যে বিপদে পড়েছি আপনি তাতে পড়েননি।' সে তাঁকে চিনতে পারেনি (তাই সে চরম শোকে তাঁকে অসঙ্গত কথা বলে ফেলল)। অতঃপর তাকে বলা হল যে, 'তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন।' সুতরাং (এ কথা শুনে) সে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুয়ারের কাছে এল। সেখানে সে দারোয়ানদেরকে পেল না। অতঃপর সে (সরাসরি প্রবেশ করে) বলল, 'আমি আপনাকে চিনতে পারিনি।' তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ''আঘাতের শুরুতে সবর করাটাই হল প্রকৃত সবর।''

মুসলিমের একটি বর্ণনায় আছে, সে (মহিলাটি) তার মৃত শিশুর জন্য কাঁদছিল।

6.আবূ হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘‘আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘আমার মু’মিন বান্দার জন্য আমার নিকট জান্নাত ব্যতীত অন্য কোন পুরস্কার নেই, যখন আমি তার দুনিয়ার প্রিয়তম কাউকে কেড়ে নই এবং সে সওয়াবের নিয়তে সবর করে।’’

7.আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বর্ণনা করেন যে, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, ‘‘আল্লাহ তা‘আলা বলেন, যখন আমি আমার বান্দাকে তার প্রিয়তম দুটি জিনিস দ্বারা (অর্থাৎ চক্ষু থেকে বঞ্চিত করে) পরীক্ষা করি এবং সে সবর করে আমি তাকে এ দু’টির বিনিময়ে জান্নাত প্রদান করব।’’

8.আবূ হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘‘আল্লাহ যার মঙ্গল চান, তাকে দুঃখ-কষ্টে ফেলেন।’’

আম্বিয়াগণের জীবনে সবরের পরিক্ষা

মানবজীবনে সুখ ও দুঃখ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কোরআনের ভাষ্যমতে মানুষকে নানাভাবে পরীক্ষা করা হয়। এমনকি যুগে যুগে মানুষকে সৎপথ প্রদর্শনকারী নবী-রাসুলরাও কঠিন বিপদের মুখোমুখি হয়েছেন। এসব ক্ষেত্রে তারা ধৈর্যের সুউচ্চ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

পবিত্র কোরআনে ধৈর্যধারণকারীর জন্য সুসংবাদ এসেছে। ইরশাদ হয়েছে, ‘আমি তোমাদের সামান্য ভয়, ক্ষুধা এবং ধনসম্পদ, প্রাণ ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দিয়ে অবশ্যই

পরীক্ষা করব, আপনি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দিন, যারা বিপদে আক্রান্ত হলে বলে, আমরা তো আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চিতভাবে তাঁর দিকেই ফিরব।' (সুরা বাকারা, আয়াত : ১৫৫-১৫৬)

সব পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণ করা ও লক্ষ্য বাস্তবায়নে অবিচল থাকা নবী-রাসুল ও মুমিনদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিপদে ধৈর্য ধারণ করলে সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।
সাআদ বিন আবু ওয়াক্কাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন, হে আল্লাহর রাসুল (সা.), মানুষের মধ্যে কে সব চেয়ে কঠিন বিপদের মুখোমুখি হয়? তিনি বলেন, প্রথমত নবীরা, অতঃপর যারা তাদের মতো। অতঃপর মানুষকে তার দ্বিনদার অনুপাতে পরীক্ষা করা হয়। কেউ শক্তভাবে দ্বিন অনুসরণ করলে তার পরীক্ষাও কঠিন হয়ে থাকে। কেউ দ্বিনদারিতে শিথিল হলে তার পরীক্ষাও তেমন হয়।
অতঃপর বান্দা একের পর এক বিপদে আক্রান্ত হতে থাকে। একপর্যায়ে সে পুরোপুরি গুনাহমুক্ত হয়ে ভূমিতে চলাফেরা করে।' (সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ২৩৯৮)

নিম্নে কঠিন সময়ে কয়েকজন নবী ও রাসুলের ধৈর্যের পরীক্ষা সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

১. মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান : প্রায় হাজার বছর ধরে নুহ (আ.) মানুষকে আল্লাহর নির্দেশনা পালনের আহ্বান জানান। কিন্তু খুবই সামান্যসংখ্যক মানুষ তার আহ্বানে সাড়া দেয়। তবু তিনি নিজ সম্প্রদায়ের ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও নির্যাতনের মধ্যে আল্লাহর পথের আহ্বান অব্যাহত রাখেন। ইরশাদ হয়েছে, 'আমি তো নুহ (আ.)-কে তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম, তিনি তাদের মধ্যে ৫০ বছর কম এক হাজার বছর অবস্থান করেন, অতঃপর তাদের প্লাবন গ্রাস করে। কেননা তারা সীমালঙ্ঘনকারী ছিল। অতঃপর আমি তাকে ও যার নৌকাবাসীকে রক্ষা করেছি এবং বিশ্ববাসীর জন্য তাকে নিদর্শন করেছি।' (সুরা আনকাবুত, আয়াত : ১৪-১৫)

২. ধৈর্যশীলদের প্রতীক যিনি : আইয়ুব (আ.) নবী ও রাসুলদের মধ্যে ধৈর্যশীল হিসেবে বিশেষভাবে সমাদৃত। পবিত্র কোরআনে তাঁর এ গুণের প্রশংসা করা হয়েছে। কারণ দীর্ঘ ১৮ বছর শারীরিক ও আর্থিক নানা সমস্যায় ভুগেও মহান আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ কৃতজ্ঞ ছিলেন তিনি। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'স্মরণ করুন আমার বান্দা আইয়ুবকে, তিনি তাঁর রবকে ডেকে বলেন, শয়তান আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলে দিয়েছে। আপনি পা দিয়ে ভূমিতে আঘাত করুন, এতে গোসলের সুশীতল পানি ও পানীয় রয়েছে। আমার অনুগ্রহে আমি তাকে তার পরিবার দান করেছি এবং তাদের মতো আরো, তা বুদ্ধিমানদের জন্য উপদেশস্বরূপ। আপনি এক মুষ্ঠি তৃণ নিয়ে আঘাত করুন এবং শপথ ভঙ্গ করবেন না, আমি তাকে ধৈর্যশীল হিসেবে পেয়েছি, কতই না উত্তম ছিলেন তিনি, তিনি ছিলেন আমার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।' (সুরা সাদ, আয়াত : ৪১-৪৪)

৩. যিনি আল্লাহর প্রিয় বন্ধু : শত বাধা-বিপত্তির মধ্যেও ইবরাহিম (আ.) আল্লাহর একত্ববাদের প্রচারে অবিচল ছিলেন। নিজ পরিবার থেকে শুরু করে নিজ সম্প্রদায়ের কাছে তিনি তাওহিদের কথা বলে যান। তারা ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে আগুনে নিক্ষেপ করে। এত কিছুর পরও তিনি স্থির ছিলেন এবং আল্লাহর প্রতিশ্রুতির প্রতি আস্থাবান ছিলেন। ফলে আল্লাহর নির্দেশে সেই জ্বলন্ত আগুন তাঁর জন্য শীতল হয়ে যায়। জীবনের পড়ন্ত বেলায় তিনি হাজেরা (আ.) ও পুত্র ইসমাইল (আ.)-কে মক্কার জনশূন্য প্রান্তরে রেখে আসেন। এমনকি তার প্রিয় পুত্রকে কোরবানি করতে বলা হয়। এসব পরীক্ষায় তিনি আল্লাহর নির্দেশ পালন করেন এবং খাঁটি বন্ধুর স্বীকৃতি লাভ করেন। ইরশাদ হয়েছে, 'দ্বিনের ক্ষেত্রে তার চেয়ে আর কে উত্তম যে সৎকর্মশীল হয়ে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং একনিষ্ঠভাবে ইবরাহিমের আদর্শ অনুসরণ করে, আল্লাহ ইবরাহিমকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন।' (সুরা নিসা, আয়াত : ১২৫)

৪. দীর্ঘ অপেক্ষার পর সন্তানের সন্ধান : ইয়াকুব (আ.) প্রিয় পুত্র ইউসুফ (আ.)-কে হারিয়ে অত্যন্ত ব্যথিত হন। তখন তিনি ধৈর্যকে নিজের একমাত্র সম্বল হিসেবে গ্রহণ করেন এবং আল্লাহর ওপর আস্থা রাখেন। ইরশাদ হয়েছে, 'তারা (ইউসুফের ভাইয়েরা) তার জামায় মিথ্যা রক্ত লেপন করে আনে, তিনি (ইয়াকুব আ.) বলেছিলেন, না, তোমরা

এই ঘটনা সাজিয়েছ, অতএব পূর্ণ ধৈর্য ধারণ করাই উত্তম, তোমরা যা বলছ এই ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্যকারী।’ (সুরা ইউসুফ, আয়াত : ১৮)।

অতঃপর ইয়াকুব (আ.) দ্বিতীয় সন্তানকে হারান। তিনি নিজের সব দুঃখ-ব্যাথাকে আল্লাহর কাছে অর্পণ করেন। ইরশাদ হয়েছে, ‘তিনি বললেন, আফসোস ইউসুফের জন্য, শোকে তার দুই চোখ সাদা হয়ে পড়ে, তিনি খুবই কষ্টে ছিলেন।...তিনি বলেন, আমি আমার দুঃখ ও বেদনা আল্লাহর কাছে আবেদন করছি এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন কিছু জানি, যা তুমি জানো না। হে আমার সন্তানরা, তোমরা যাও, ইউসুফ ও তার ভাইকে অনুসন্ধান কোরো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হইয়ো না। কেননা অবিশ্বাসী ছাড়া কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয় না।’ (সুরা ইউসুফ, আয়াত : ৮৬-৮৭)

৫. মাছের উদরে আল্লাহকে স্মরণ : ইউনুস (আ.) দীর্ঘ সময় মানুষকে আল্লাহর নির্দেশ পালনের কথা বলেন। কিন্তু অল্প কয়েকজন ছাড়া কেউ তার মানেনি। নিরাশ হয়ে তিনি তাদের ছেড়ে চলে যান। অতঃপর নানা ঘটনার পর তাঁর আশ্রয় হয় একটি মাছ উদরে। সেখানে তিনি ৪০ দিন পর্যন্ত অতবাহিত করেন। এ সময় তিনি শুধু আল্লাহর কাছে অনুনয় করে দোয়া করতেন। ইরশাদ হয়েছে, ইউনুস ছিল রাসুলদের একজন। স্মরণ করুন, তিনি পালিয়ে একটি ভর্তি নৌকায় যান। অতঃপর লটারিতে অংশ পরাজিত হন। তাকে একটি বড় মাছ গিলে ফেলে তখন তিনি নিজেকে তিরস্কার করতে থাকেন। তিনি আল্লাহর তাসবিহ না পড়লে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত মাছের উদরে থাকতেন।’ (সুরা সাফফাত, আয়াত : ১৩৯-১৪৪)

মুসা (আঃ) এর ধৈর্য

মুসা আঃ তার জাতিকে একত্ববাদের দাওয়াত দিলেন অনেক বছর। কিন্তু জাহান্নামের কোটগুলো মুসা নবীকে হাজারো কষ্ট দিয়েছিল।তবুও তিনি তাদের কষ্টকে উপেক্ষা করে তাদেরকে এক আল্লাহর পথে ডেকেছেন। তিনি তাদের কষ্টের কাছে হেরে যান নি অধৈর্য ও হননি। ফেরাউন জাতিও তাকে খুব কষ্ট দিয়েছে। তিনি তাতে ধৈর্যধারণ করেছেন। অবশেষে আল্লাহ এ জাতিকে ধ্বংস করে দেন। এরপর যখন বনি ইসরাইলরা খুব কষ্ট দিয়েছিল তাতেও তিনি ধৈর্যধারণ করেছেন।

রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মাঝে মাঝে নবীদের ধৈর্যধারণের কথা আলোচনা পর্যালোচনা করতেন তখন মুসা নবীর ধৈর্যধারণের কথা বলতেন।

"আল্লাহ তায়ালা মুসার প্রতি রহম করুন। তাকে এর থেকেও অনেক কষ্ট দেওয়া হয়েছে। তিনি কতো কষ্ট সহ্য করেছেন। "

কবি আরও সুন্দর করে বলেছেন ---

“ সয়েছে মুসা ফেরাউনজাতির কত অত্যাচার
ধৈর্যের ফলে নীলনদ জলে রাস্তায় হলো পার।”

তাই পবিত্র কোরআনে মহানবী (সা.)-কে তার কথা উল্লেখ করে তার মতো ধৈর্যহারা হতে বারণ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, ‘অতএব আপনি আপনার রবের নির্দেশে ধৈর্য ধারণ করুন, আপনি মাছাওয়ালার মতো হবেন না, যখন তিনি দুঃখে কাতর হয়ে ডেকেছিলেন। তার রবের অনুগ্রহ তার কাছে না পৌঁছলে তিনি লাঞ্ছিত হয়ে উন্মুক্ত প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত হতেন।’ (সুরা কলম, আয়াত : ৪৮)

মুহাম্মাদ সাঃ এর জীবনে সবর

মহানবী (সা.) ছিলেন ধৈর্যের মূর্তপ্রতীক। তিনি পৃথিবীতে আগমনের আগে তার পিতা ইহলোক ত্যাগ করেন। ফলে অনাথত্বের দুঃখণ্ডকষ্টের ওপর তাকে ধৈর্যধারণ করতে হয়। মাত্র ৬ বছর বয়স হওয়ার পর মা আমিনা এ ধরাধাম হতে চিরবিদায় নেন। ফলে মায়ের আদর হতে বঞ্চিত অবস্থায় অসহায়ভাবে ধৈর্যধারণ করে জীবনযাপন করতে হয়। আট বছর বয়সে দাদা আবদুল মুত্তালিব পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। দাদার আদর হতে বঞ্চিত হয়েও তিনি ধৈর্যধারণ করেন। এরপর চাচা আবু তালিবের তত্ত্বাবধানে দুঃখণ্ডকষ্টে তার জীবন অতিবাহিত হতে থাকে। ২৫ বছর বয়সে খাদিজা (রা.)-এর সঙ্গে বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হন। এভাবে তেমন কোনো শুভাকাক্সক্ষী না থাকা অবস্থায়ই তার জীবনের ৪০টি বসন্ত পেরিয়ে যায়। এরপর ৪০ বছর বয়সে যখন নবুওয়তপ্রাপ্ত হন, তখন দ্বীন ইসলামের প্রচারে নানা বাঁধা-বিপত্তির সম্মুখীন হন। সব বাঁধা উপেক্ষা করে তিনি দ্বীন ইসলামের প্রচার ও প্রসার চালিয়ে যেতে থাকেন। কোরাইশের লোকরা তাকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিতে থাকে ও নানা বিদ্রুপবাণে জর্জরিত করতে থাকে। মহানবী (সা.) এসব কিছুর ওপর ধৈর্যধারণ করে ইসলামের প্রচার-প্রসার চালিয়ে যেতে থাকেন। লোকরা আশানুরূপভাবে ঈমান না আনার কারণে তিনি পরিতাপ করতে থাকেন। লোকদের ঈমান না আনার বিষয়টি তাকে কষ্ট দিতে থাকে। তিনি পরিতাপ ও আফসোস করার সঙ্গে সঙ্গে ধৈর্যধারণ করতে থাকেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহতায়ালা বলেন, ‘যদি তারা এ বিষয়বস্তুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে, তবে তাদের পেছনে সম্ভবত আপনি পরিতাপ করতে করতে নিজের প্রাণ শেষ করে ফেলবেন।’ (সুরা কাহফ : ৬)।

নামাজে বাধা ও নবীজির সবর

মহানবী (সা.)-এর জন্য দ্বীন ইসলামের প্রচার ও প্রসারের পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। এ পথে ধৈর্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে তাকে বহু কণ্টকময় পথ পাড়ি দিতে হয়েছে; কোরাইশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অত্যাচার, নির্যাতন ও নিপীড়নের সম্মুখীন হতে

হয়েছে। নিজের পরিবার-পরিজন ও গোত্রসহ আবু তালিবের ঘাঁটিতে ৩ বছরের বন্দি জীবন অতিবাহিত করতে হয়েছে। কিন্তু কোনো অবস্থায়ই তিনি থেমে যাননি। সর্বাবস্থায় দ্বীন ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজ অব্যাহত রেখেছেন; আপন লক্ষ্যে অবিচল থেকেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, একবার রাসুল (সা.) সেজদারত ছিলেন। তার আশপাশে কোরাইশের মুশরিকদের কিছু লোক ছিল। এ সময় উকবা ইবনে আবু মুআইত উটের ভুঁড়ি এনে মহানবী (সা.)-এর পিঠে ফেলে দিল। ফলে তিনি তার মাথা তুলতে পারলেন না। অবশেষে ফাতেমা (রা.) এসে তার পিঠ হতে তা সরিয়ে দেন। আর যে ব্যক্তি এ কাজ করেছে, তার বিরুদ্ধে বদদোয়া করলেন। এরপর রাসুল (সা.) বললেন, 'হে আল্লাহ! কোরাইশদের এ দলের বিচার আপনার ওপর ন্যাস্ত করলাম। হে আল্লাহ! আপনি আবু জাহেল ইবনে হিশাম, উতবা ইবনে রবিআ, শাইবা ইবনে রবিআ, উকবা ইবনে আবু মুআইত ও উমাইয়া ইবনে খালফকে শাস্তি দিন।' ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, আমি দেখেছি, তারা সবাই বদর যুদ্ধে নিহত হয়। উমাইয়া অথবা উবাই ছাড়া তাদের সবাইকে কূপে নিক্ষেপ করা হয়। কেননা, সে ছিল মোটা দেহের। যখন তার লাশ টানা হচ্ছিল, তখন কূপে নিক্ষেপ করার আগেই তার জোড়াগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।' (বোখারি : ৩১৮৫)।

কাফেরদের নির্যাতনে নবীজির সবর

ইসলামের প্রচার ও প্রসারের পথে কোরাইশের লোকেরা মহানবী (সা.)-এর ওপর অত্যন্ত অসভ্য, বর্বর ও পাশবিক আচরণ করত। কিন্তু রাসুল (সা.) এ ধরার বুকে দ্বীন ইসলামকে বিজয়ী করার লক্ষে সব কষ্ট সহ্য করে নিতেন। অম্লান বদনে বরদাশত করতেন কাফের বে-দ্বীনের অন্যায়-অত্যাচার। উরওয়াহ ইবনে যুবায়ের (রহ.) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, মক্কার মুশরিকরা রাসুল (সা.)-এর সঙ্গে সবচেয়ে কঠিন আচরণ কী করেছিল? তিনি বললেন, আমি উকবা ইবনে আবু মুআইতকে দেখেছি, সে মহানবী (সা.)-এর কাছে এলো, যখন তিনি নামাজ আদায় করছিলেন। সে নিজের চাদর দিয়ে রাসুল (সা.)-এর গলায় জড়িয়ে শক্ত করে চেপে

ধরল। আবু বকর (রা.) এসে উকবাকে সরিয়ে দিলেন এবং বললেন, 'তোমরা কি এমন লোককে মেরে ফেলতে চাও, যিনি বলেন, একমাত্র আল্লাহই আমার প্রতিপালক! যিনি তার দাবির স্বপক্ষে তোমাদের রবের কাছ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ সঙ্গে নিয়ে এসেছেন?' (বোখারি : ৩৬৭৮)।

বিপদাপদে ও অনাহারে সবর

পৃথিবীতে যত নবী-রাসুল এসেছেন, সবাইকেই বিভিন্ন বালা-মসিবতের সম্মুখীন হতে হয়েছে। কারণ, যুগে যুগে একত্ববাদের অনুসারী খুব কম লোকই হয়েছে। হক-বাতিলের দ্বন্দ্ব চিরন্তন। এই চিরন্তন দ্বন্দ্বের ধারাবাহিকতায় সব সময় সত্য ও মিথ্যার লড়াই হয়েছে। এ ক্ষেত্রে হকের বিরোধী লোক বেশি থাকার কারণে সত্যের ধারক-বাহকদের ধৈর্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে দৃঢ়তার সঙ্গে শত্রুর মোকাবিলা করতে হয়েছে। বিশ্বনবী (সা.)-ও এ নিয়মের ব্যতিক্রম নন। তাকেও দ্বীনের পথে বহু কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করতে হয়েছে। করতে হয়েছে ধৈর্যধারণ। সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) বলেন, আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসুল! কোন মানুষের সর্বাপেক্ষা কঠিন পরীক্ষা হয়?' তিনি বললেন, 'নবীদের। এরপর মর্যাদার দিক থেকে তাদের পরবর্তীদের, তারপর তাদের পরবর্তীদের। বান্দাকে তার দ্বীনদারির মাত্রা অনুসারে পরীক্ষা করা হয়। যদি সে তার দ্বীনদারিতে অবিচল থাকে, তবে তার পরীক্ষাও হয় কঠিন। আর যদি সে তার দ্বীনদারিতে নমনীয় হয়, তবে তার পরীক্ষাও সে অনুযায়ী হয়। এরপর বান্দা অহরহ বিপদাপদে পরিবেষ্টিত থাকে। শেষে সে পৃথিবীর বুকে গোনাহমুক্ত হয়ে পবিত্র অবস্থায় বিচরণ করে।' (সুনানে ইবনে মাজাহ : ৪০২৩)। রাসুল (সা.) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। ফলে তার পরীক্ষা হয়েছিল কঠিন থেকে কঠিনতর। আনাস (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) বলেছেন, 'আমাকে আল্লাহর পথে যেভাবে ভয় দেখানো হয়েছে, আর কাউকে সেভাবে দেখানো হয়নি। আমাকে আল্লাহতায়ালার উদ্দেশে যেভাবে যন্ত্রণা দেয়া হয়েছে, আর কোনো ব্যক্তিকে সেভাবে যন্ত্রণা দেয়া হয়নি। আমার ওপর দিয়ে ত্রিশটি দিনরাত এমনভাবে অতিবাহিত হয়েছে যে, বেলালের বগলের মধ্যে রক্ষিত সামান্য খাদ্য ছিল

আমার ও বেলালের সম্বল। তা ছাড়া এতটুকু আহারও ছিল না, যা কোনো প্রাণধারী প্রাণী খেয়ে জীবন ধারণ করতে পারে।' (তিরমিজি : ২৪৭২)।

পরিবার-পরিজনের মৃত্যুতে ধৈর্যধারণ

মহানবী (সা.) তার আত্মীয়-স্বজন, পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততির মৃত্যুতে ধৈর্যধারণ করেছেন। খাদিজা (রা.) মৃত্যুবরণ করলে তিনি অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত ও কাতর হয়ে পড়েন। তিনি এতটাই ভারাক্রান্ত হন যে, তার মৃত্যুর বছরকে 'শোকের বছর' বলে নামকরণ করেন। যয়নাব (রা.)-এর এক সন্তান মৃত্যুবরণ করলে মহানবী (সা.) হা-হুতাশ না করে ধৈর্যধারণ করেন ও নীরবে অশ্রুপাত করতে থাকেন। ওসামা ইবনে যায়েদ (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর জনৈক কন্যা (যয়নাব) নবী (সা.)-এর কাছে এ বলে লোক পাঠালেন, 'আমার এক পুত্র মরণাপন্ন অবস্থায় রয়েছে, তাই আপনি আমাদের কাছে আসুন।' তিনি বলে পাঠালেন, '(তাকে) সালাম দেবে ও বলবে, আল্লাহরই অধিকারে রয়েছে, যা কিছু তিনি নিয়ে যান। আর তাঁরই অধিকারে রয়েছে, যা কিছু তিনি দান করেন। তাঁর কাছে সবকিছুরই একটি নির্দিষ্ট সময় আছে। কাজেই সে যেন ধৈর্যধারণ করে এবং পুণ্যের অপেক্ষায় থাকে।' তখন তিনি তার কাছে কসম দিয়ে পাঠালেন, তিনি যেন অবশ্যই আগমন করেন। তখন তিনি দাঁড়ালেন। তার সঙ্গে সাদ ইবনে উবাদা, মুআজ ইবনে জাবাল, উবাই ইবনে কাব, যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.)-সহ আরও কয়েকজন সাহাবি ছিলেন। তখন শিশুটিকে রাসুল (সা.)-এর কাছে তুলে দেয়া হলো। তখন সে ছটফট করছিল। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা ধারণা যে, তিনি এ কথা বলেছিলেন, যেন তার নিঃশ্বাসে মশকের মতো শব্দ হচ্ছিল! আর নবীজি (সা.)-এর দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছিল। সাদ (রা.) বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! এ কি?' তিনি বললেন, 'এ হচ্ছে দয়া, যা আল্লাহ তাঁর বান্দার অন্তরে গচ্ছিত রেখেছেন। আর আল্লাহ তো তাঁর দয়ালু বান্দাদের প্রতিই দয়া করেন।' (বোখারি : ১২৮৪)।

মহানবী (সা.)-এর ঔরসজাত সন্তান ইবরাহিম (রা.) মৃত্যুবরণ করলে তখনও তিনি কান্নাকটি ও বিলাপ না করে ধৈর্যধারণ করেন। অবশ্য দয়া ও করুণার অশ্রু তার চোখ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, 'আল্লাহর সিদ্ধান্তে আমি সন্তুষ্ট।' আনাস

ইবনে মালেক (রা.) বলেন, আমরা রাসুল (সা.)-এর সঙ্গে আবু সায়ফ কর্মকারের কাছে গেলাম। তিনি ছিলেন নবী-তনয় ইবরাহিম (রা.)-এর দুধ সম্পর্কীয় বাবা। রাসুল (সা.) ইবরাহিম (রা.)-কে তুলে নিয়ে চুমু খেলেন এবং নাকে-মুখে লাগালেন। এরপর (আরেকবার) আমরা তার (আবু সায়ফের) বাড়ি গেলাম। তখন ইবরাহিম (রা.) মুমূর্ষু অবস্থায়। এতে রাসুল (সা.)-এর উভয় চোখ গড়িয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। তখন আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আপনিও কাঁদছেন?' রাসুল (সা.) বললেন, 'অশ্রু প্রবাহিত হয়। আর হৃদয় হয় ব্যথিত। তবে আমরা মুখে তা-ই বলি, যা আমাদের রব পছন্দ করেন। হে ইবরাহিম! তোমার বিচ্ছেদে আমরা অবশ্যই শোকসন্তপ্ত।' (বোখারি : ১৩০৩)।

দ্বীনের পথে সাহাবিদের সবর

সাহাবায়ে কেরামদের অবস্থা এই ছিল যে, যার গোত্রীয় শক্তি ছিল, সে তার গোত্রের সাহায্য পেত এবং স্বীয় গোত্রের লোকেরা তাকে অন্যান্য কাফেরদের কষ্ট হতে রক্ষা করত। কিন্তু বহু সংখ্যক সাহাবীর এ রকম কোন ব্যবস্থা ছিল না। তারা দ্বীনের পথে কুরাইশদের পক্ষ হতে কঠিক যন্ত্রনা ও পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন। তারা ভোগ করেছেন নানা ধরণের শাস্তি ও জুলুম-নির্যাতন। তাদের মধ্যে ছিলেন আম্মার বিন ইয়াসির, তাঁর মাতা সুমাইয়া এবং তাঁর পরিবার। তারা আল্লাহর পথে কঠোর শাস্তি ভোগ করেছেন।

যখন মরুর বালু উত্তপ্ত হয়ে উঠত তখন তাদেরকে চিৎ করে শায়িত করে শাস্তি দিত। সে অবস্থায় একদা রসূলুল্লাহ্ (ﷺ) তাঁদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় বলেছিলেন- ''হে ইয়াসের পরিবার ধৈর্য ধারণ করো, তোমাদের ঠিকানা হচ্ছে জান্নাত।'' অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ইয়াসের ইন্তেকাল করেন।

দুর্বৃত্ত আবু জাহল সুমাইয়া (রাঃ) এর লজ্জাস্থানে তীর দিয়ে আঘাত হানলে তৎক্ষণাৎ তিনি শাহাদত বরণ করেন। তিনি ছিলেন ইসলামের প্রথম শহীদ। তারা আম্মারের উপরও শাস্তি কঠোর করে, কখনও তাকে তারা উত্তপ্ত রোদ্রে ফেলে শাস্তি দিত, কখনও ভারি প্রস্তর তার উপরে চাপিয়ে রাখতো, আবার কখনও আগুনে দগ্ধকরে শাস্তি দিত এবং বলতোঃ যতক্ষণ তুমি মুহাম্মাদ (ﷺ) কে গালি না দিবে অথবা ''লাত'' ও ''উয্যা'' সম্পর্কে ভালো কথা না বলবে ততক্ষণ আমরা তোমাকে ছাড়বোনা। তিনি বাধ্য হয়েই তাদের কথায় সম্মতি দেন এবং পরবর্তীতে ক্রন্দনরত অবস্থায় ও রসূল (ﷺ) এর নিকট ক্ষমা প্রার্থনার জন্য উপস্থিত হন। আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রেক্ষিতে এই আয়াতটি নাযিল করেন-

مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ

''যার উপর জবরদস্তি করা হয় এবং তার অন্তর বিশ্বাসে অটল থাকে সে ব্যতীত যে কেউ বিশ্বাসী হওয়ার পর যদি আল্লাহতে অবিশ্বাসী হয়- তাদের উপর পতিত হবে আল্লাহর গযব''। (সূরা নাহল-২৭:১০৬)

যেসমস্ত সাহাবী কাফেরদের নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন বিলাল (রাঃ) তাদের অন্যতম। তাকে আল্লাহর রাস্তায় কঠিন শাস্তি দেয়া হয়েছে। আল্লাহর জন্য নিজের জানকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন এবং স্বজাতির কাছে নিজেকে ছেড়ে রেখেছিলেন। মুশরিকরা তাঁকে দুষ্ট ছেলেদের হাতে তুলে দিয়েছিল। ওরা তাঁকে মক্কার গলিতে টেনে নিয়ে বেড়াত, আর তিনি বলতেন, আহাদ, আহাদ। ওরাকা বিন নাওফাল তাঁর পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় বলতেন- হ্যাঁ, বিলাল। ঠিক বলছ। আহাদ, আহাদ। আল্লাহ্ এক, আল্লাহ্ এক। আল্লাহর শপথ! তোমরা যদি তাঁকে হত্যা করে ফেল আমি তাঁর হত্যায় মমতা প্রকাশ করব।

বিলাল (রাঃ) উমাইয়া বিন খালফের দাস ছিলেন। উমাইয়া তাকে লাঠি দিয়ে আঘাত করত, উত্তপ্ত রৌদ্রে অভূক্ত অবস্থায় ফেলে রাখত। যখন দ্বি-প্রহরের কঠিন রোদে বালু উত্তপ্ত হয়ে উঠতো তখন তাকে মক্কার মরুভূমিতে নিয়ে যেত, অতঃপর চিৎ করে শুইয়ে তার বক্ষদেশে বিশাল একটি পাথর চাপিয়ে দিত। তখন তিনি বলতেন, আহাদ, আহাদ

(আল্লাহ্ এক, আল্লাহ্ এক)। একদা আবু বকর (রাঃ) তাঁর নিকট দিয়ে অতিক্রম করলেন, সে সময় তার শাস্তি হচ্ছিল। তিনি তাকে একটি কৃষ্ণ দাসের বিনিময়ে ক্রয় করেন। মতান্তরে তিনি তাকে পাঁচ উকিয়া (দু'শ দিরহাম) রৌপ্যের বিনিময়ে ক্রয় করে আযাদ করে দিয়েছিলেন।

মানব জীবনে ধৈর্যের প্রয়োজনীয়তা

যে গুণাবলী মানুষের জীবনকে সফল ও সার্থক করে তোলে তন্মধ্যে সহিষ্ণুতা বা ধৈর্যশীলতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই বিশেষ গুণটির সামনে অন্যায়-অনাচার মাথানিচু করে। ফলে সহিষ্ণু ব্যক্তি স্বীয় গৌরবে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। সহিষ্ণুতা জীবন বিকাশের প্রবল বাধাকে অনুকূলে আনয়ন করে, বিজয়ী ঘোষণা করে সহনশীল মানুষকে। সহিষ্ণুতা বা সবর বলতে বুঝায় সংযম অবলম্বন ও নফসের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ। সহ্য করার বৈশিষ্ট্যের নাম সহিষ্ণুতা। নিজের মনোভাবের সঙ্গে ঐকমত্য সৃষ্টি করে না এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে নিজের ক্ষমতা ও ঔদ্বত্য প্রকাশ না করে নম্রতা ও সৌজন্যের মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে মোকাবিলা করাই ধৈর্যশীলতা।

সহিষ্ণুতা গুণসম্পন্ন মানুষ কখনও বিরোধকে প্রবল করে তোলে না। ধৈর্যধারণকারী মানুষ নিজের সমূহ ক্ষতি স্বীকার করে অন্যকে হাসিমুখে মোকাবিলা করে। নিজের শক্তি-সামর্থ থাকলেও যে অপরের ওপর প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে উঠে না তার মধ্যে সহিষ্ণুতা গুণ বিদ্যমান বলে বিবেচনা করা চলে। অপরের ঔদ্ধত্যকে যে ব্যক্তি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করে সে ব্যক্তি যথার্থ ধৈর্যশীল বলে মর্যাদা পায়। এভাবে সহিষ্ণুতার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ধৈর্য, ক্ষমা ও মহত্ত্বের পরিচয় মেলে।

পবিত্র কোরআনে কারিম হাদিসের পরিভাষায় সবরের ৩টি শাখা রয়েছে—

এক. নফসকে হারাম এবং নাজায়েজ বিষয়াদী থেকে বিরত থাকা,
দুই. ইবাদত ও আনুগত্যে বাধ্য করা এবং
তিন. যেকোনো বিপদ ও সংকটে ধৈর্যধারণ করা। অর্থাৎ সে সব বিপদাপদ এসে উপস্থিত হয় সেগুলোকে আল্লাহর বিধান বলে মেনে নেয়া এবং এর বিনিময়ে আল্লাহর

তরফ থেকে প্রতিদান প্রাপ্তির আশা করা। অবশ্য কষ্টে পড়ে যদি মুখ থেকে কোনো কাতর শব্দ উচ্চারিত হয়ে যায়, কিংবা অন্যের কাছে তা প্রকাশ করা হয়, তবে তা সবরের পরিপন্থী নয়। -ইবনে কাসির

সবরের উপরোক্ত ৩টি শাখাই প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। কোরআন-হাদিসের পরিভাষায় ধৈর্যধারণকারী বা 'সাবের' সে সমস্ত লোককেই বলা হয়, যারা উপরোক্ত তিন প্রকারেরই সবরের অবলম্বন করে।

মানব জীবনে সহিষ্ণুতার প্রয়োজনের শেষ নেই। মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করে। সমাজের সকল মানুষ এক রকম নয়। সামাজিক জীবনে পরস্পরের মধ্যে নানা কারণে বিরোধিতা দেখা দেয়। এই বিরোধ সহজেই প্রবল আকার ধারণ করতে পারে এবং তার পরিণতি ভয়াবহ হতে পারে। এই ধরনের সংকটজনক পরিস্থিতির ক্ষতিকর পরিণাম থেকে অব্যাহতি লাভের দরকার সহিষ্ণুতার মতো সৎ গুণের। সমাজের মধ্যে নানান ধরনের লোক বসবাস করে। সকলের রুচি ও মনমানসিকতা এক রকম নয়। ফলে পারস্পরিক বিরোধ এবং প্রতিহিংসার সৃষ্টি সাধারণ ব্যাপার। এই পরিস্থিতির কল্যাণকর সমাধানের জন্য সহিষ্ণুতার প্রয়োজন। মানুষের ব্যক্তিজীবনে কঠোর সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়। সেখানে অনেক প্রতিপক্ষ থাকে। তাদের কাছে সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়ে মন জয় করা যায়। মতবিরোধ এড়িয়ে সদিচ্ছাকে বাস্তবায়িত করতে পারলে বেশি লাভবান হওয়া সম্ভব। সহিষ্ণুতার মহৎ গুণটি এখানে বিশেষ অর্থবহ ভূমিকা পালন করে। সামাজিক জীবনের মতো রাজনৈতিক কর্মকান্ডে সহনশীলতার প্রয়োজন রয়েছে। পরস্পর বিরোধ এড়িয়ে, প্রতিপক্ষকে শত্রু বলে বিবেচনা না করে সহযোগিতার মাধ্যমে কাজকর্ম চালিয়ে গেলে সেখানে সহিষ্ণুতার নিদর্শন মেলে। সকল কাজের শুভ পরিণতি আনয়নে সহিষ্ণুতা সাহায্য করে। যোগ্যতা দিয়ে মানুষ সমাজে টিকে থাকে। সে যোগ্যতা প্রদর্শন ও তার ফল হাতে না আসা পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করে অপেক্ষা করতে হবে। উগ্র প্রতিপক্ষকে শক্তির সাহায্যে পরাভূত করার চেয়ে ধৈর্যধারণ করার মাধ্যমে পরাভূত করা সহজ। জীবনের প্রতিকূল অবস্থায় সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করতে পারলে দুঃখ, কষ্ট ও মনোবেদনা থেকে রেহাই পাওয়া যায়। তাই জীবনে সহিষ্ণুতার গুরুত্ব অনুধাবন করতে হবে।

জীবনকে সুন্দর, সার্থক ও মহৎ করার জন্য সহিষ্ণুতার ব্যাপক অনুশীলনতা করা দরকার। এর প্রতিদানে আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ ধৈর্যশীলদের অনুকূলেই থাকেন। ' –সূরা বাকারা : ১৫৪

পবিত্র কোরআনে আরো ঘোষণা করা হয়েছে, 'সবরকারী বান্দাদেরকে তাদের পুরস্কার বিনা হিসেবে প্রদান করা হবে। ' -সূরা আজ জুমার : ১০

সহিষ্ণু হলে জীবনে যে সাফল্য আসে তার প্রভাব চারপাশের জীবনে সহজেই প্রত্যক্ষ করা যায়। জীবনের কল্যাণের জন্য, মানুষের কল্যাণের জন্য সহিষ্ণুতার পথ অনুসরণ করতে হবে। জীবনকে সুন্দর ও সফলকাম করার যে সাধনায় মানুষ নিজেকে সমর্পণ করেছে তা করার জন্য সহিষ্ণুতাকে উৎস হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। তাহলে জীবন হয়ে উঠবে সার্থক ও সুন্দর।

পারিবারিক জীবনে ধৈর্যের গুরুত্ব

একটি পরিবার মানে ছোটখাটো একটি সমাজ বা রাষ্ট্র। কয়েকজন মানুষের একান্ত জীবন একসঙ্গে অতিবাহিত হয় বছরের পর বছর। তাই এখানেও পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় রাখতে প্রয়োজন ছাড় দেওয়ার মানসিকতা, যা ধৈর্যচর্চার মাধ্যমে অর্জিত হয়। দাম্পত্য জীবন নিয়ে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে, যেখানে ভালোবাসার সম্পর্ক নড়বড়ে হয় সেখানে ভুল বেশি খোঁজা হয়। ছোট ছোট বিষয়ে বিশাল মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়ে যায়। এজন্য শরিয়ত নির্দেশ দিয়েছে, সবর ও ধৈর্যের। এর ফল মানুষ দুনিয়ায়ও ভোগ করবে, পরকালেও লাভ করবে। সবার কর্তব্য, সাহস ও সহিষ্ণুতা দিয়ে পরিবারকে নিয়ন্ত্রণ করা। এটা কত দোষের কথা, স্বামী তার স্ত্রী সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদে জড়ায়, যে স্ত্রী তার জন্য নিজের জীবনকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত! আর স্ত্রীই বা কীভাবে স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে অথচ স্বামীর কারণে তার বিশেষ মর্যাদা অর্জিত হয়। পরস্পরকে সহিষ্ণুতা দিয়ে বরণ করতে পারা থেকেই এ ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়।

ভুল বা দোষ সব মানুষেরই থাকে। তাই প্রথমে ভুল বা দোষ চিহ্নিত করে ধৈর্যের সঙ্গে অন্যকে বোঝানো যায়। কিন্তু স্বামী যদি ওঁৎ পেতে থাকে স্ত্রীর ভুলভ্রান্তি কীভাবে ধরা যায় আর স্ত্রী লেগে থাকে, স্বামীকে কীভাবে ঘায়েল করা যায়, তা হলে খুশি হয় শয়তান। কারণ হাদিসে এসেছে, শয়তান খুশি হয় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করতে পারলে। অনেক সময় এই ঝগড়া তৃতীয় কোনো কারণে হয়ে থাকে। অনেক সময় হয়তো স্বামী-স্ত্রী নিজেদের কারণে ঝগড়ায় জড়ায় না, তৃতীয় কারও উসকানিতে ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়ে। এটাও ঘটে ধীরে-সুস্থে ঠান্ডা মাথায় ধৈর্যের সঙ্গে সমস্যার মূল চিহ্নিত করতে না পারায়। পরিবারে স্ত্রীর কর্তব্য, স্বামীর পরিবারের সবাইকে খুশি রাখা আর স্বামীর কর্তব্য স্ত্রীর বাড়ির সবাইকে খুশি রাখা। যেখানে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই এমন ত্যাগের মানসিকতা রাখে, সেখানে সচরাচর বিবাদ বা অসন্তোষ দেখা দেয় না। কখনও একজন রাগ হলে অন্যজনের উচিত হলো ধর্য ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে তা সামাল দেওয়া, একই সঙ্গে দুজন রাগ করলে পরিস্থিতি বেসামাল হয়ে পড়ে।

যে পরিবারে ধৈর্যের চর্চা থাকবে, সে পরিবারে শান্তি ও সুখের দেখা মিলবে। কারণ ধৈর্যধারণকারীদের সঙ্গে আল্লাহ থাকেন। পবিত্র কোরআনে এসেছে, 'হে মুমিনগণ, তোমরা ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।' (সুরা বাকারা : ১৫৩)।
ধৈর্যশীলদের জন্য রয়েছে সফলতার সুসংবাদ। এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আমি তোমাদেরকে কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা অবশ্যই পরীক্ষা করব। তুমি শুভ সংবাদ দাও ধৈর্যশীলদের, যারা তাদের ওপর বিপদ আপতিত হলে বলে, (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) 'আমরা তো আল্লাহর এবং নিশ্চিতভাবে তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী।' (সুরা বাকারা : ১৫৫-১৫৭)।
একটি সুখময় দাম্পত্য জীবন গড়ে তুলতে স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই স্বপ্রণোদিত ভূমিকা জরুরি।

দুর্যোগ আল্লাহর পরীক্ষা

আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন সময় নানা বিপদ-আপদ ও বালা–মসিবতের মাধ্যমে মানুষের ইমান, আমল ও নির্ভয়তার পরীক্ষা নেন।

কোরআন মাজিদে আছে, ‘আর আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং জানমাল ও ফল–ফলাদির ক্ষতির মাধ্যমে। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও, যারা নিজেদের বিপদের সময় বলে “নিশ্চয় আমরা আল্লাহর এবং নিশ্চয় আমরা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী”; তাদের ওপরই রয়েছে তাদের রবের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও করুণা এবং তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত।’ (সুরা-২ বাকারা, আয়াত: ১৫৫-১৫৭)।

নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে পৃথিবী ভারাক্রান্ত হলে; প্রাকৃতিক দুর্যোগ তথা ঝড়, ভারী বর্ষণ, সাইক্লোন, শিলাবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি-খরা-শুষ্কতা, প্রবল বাতাস, ভূমিকম্প, সাগরের পানি বিপৎসীমায় পৌঁছে যাওয়া, নদ-নদীর পানি বিপৎসীমা অতিক্রম করা, দুর্ভিক্ষ, মহামারি, অগ্নিকাণ্ড, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, শৈত্যপ্রবাহ, দাবদাহ, অগ্ন্যুৎপাত, লাভা উদ্‌গিরণ, সম্পদহানি, প্রাণহানি, বরকতশূন্যতা, ক্ষতির প্রাবল্য প্রভৃতি দেখা দেয়।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেন, ‘মানুষের কৃতকর্মের কারণে স্থলে ও সমুদ্রে বিপর্যয় প্রকাশ পায়। যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাদের কিছু কৃতকর্মের স্বাদ তাদের আস্বাদন করান, যাতে তারা (সুপথে) ফিরে আসে।’ (সুরা-৩০ রুম, আয়াত: ৪১)

‘তোমাদের ওপর যেসব বিপদ–আপদ আপতিত হয়, তা তোমাদেরই কর্মফল। তিনি অনেক গুনাহ মাফ করে দেন।’ (সুরা-৪২ শূরা, আয়াত: ৩০)

‘আর কী ব্যাপার! যখন তোমাদের ওপর মসিবত এল, যার দ্বিগুণ (অপরাধ) তোমরা ঘটিয়েছ, তখন তোমরা বললে, “এটা কোত্থেকে এল!” (হে নবী!) আপনি বলে দিন, এ তো তোমাদের পাপ থেকেই; নিশ্চয় আল্লাহ সব বিষয়েই সর্বশক্তিমান।’ (সুরা-৩ আলে ইমরান, আয়াত: ১৬৫; তাফসিরে মাআরিফুল কোরআন, পৃষ্ঠা: ৬৭৫৩)

হাদিস শরিফে এসেছে, ‘যে মাপে কম দেবে, সে দুর্ভিক্ষ, মৃত্যুযন্ত্রণা এবং শাসক কর্তৃক জুলুমের শিকার হবে।’ ‘যে জাতির মধ্যে ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়ে; সেখানে (ক্রমাগত) অনাবৃষ্টি দেখা দেয়।’ ‘যখন অন্যায়-অনাচার, জিনা-ব্যভিচার বৃদ্ধি পায়, অন্যের হক ভূলুণ্ঠিত হতে থাকে, মাপে কম দেওয়া ও চোরাচালানি প্রভৃতির প্রাচুর্য হয়, তখন দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। আসমানি গজব বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ একের পর এক নামতে শুরু করে।’ (তাফসিরে রুহুল মাআনি: ১১/৭৩; তাফসিরে মাআরিফুল কোরআন: ৬/৭৫৩)

বিপদের সময় অনুতপ্ত হওয়া এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা সুন্নত। যতক্ষণ বান্দা তাওবা-ইস্তিগফার করতে থাকে, ততক্ষণ আল্লাহর আজাব আসে না। তাই আমাদের বেশি বেশি তওবা-ইস্তিগফার করতে হবে এবং নির্দিষ্ট মাসনুন দোয়াগুলো পড়তে হবে।

‘প্রচণ্ড ঝোড়ো হাওয়া বইলে রাসুলুল্লাহ (সা.) মসজিদে যেতেন, আজান দিতেন ও নামাজে মশগুল হতেন।’ (মিশকাত: ৬৯৬ ও ৫৩৪৫)

বৃষ্টির সময় পড়ার দোয়া, ‘আল্লাহুম্মা ছাইয়েবান নাফিআ’ (হে আল্লাহ! উপকারী বৃষ্টি দিন)। (তিরমিজি)

ঝড়-তুফানের সময় পড়ার দোয়া, ‘আল্লাহুম্মা হাওয়ালাই না, ওয়া লা আলাইনা (হে আল্লাহ! আমাদের আশপাশে ফিরিয়ে নিন, আমাদের ওপর দেবেন না)।’ (মুসলিম ও তিরমিজি)

বজ্রপাতের সময় পড়ার দোয়া, ‘আল্লাহুম্মা লা তাকতুলনা বিআজাবিকা ওয়া লা তুহলিকনা বিগদাবিকা ওয়া আফিনা কাবলা জালিকা (হে আল্লাহ! আজাব ও গজব দিয়ে আমাদের ধ্বংস ও নিঃশেষ করে দেবেন না; তার আগেই আমাদের ক্ষমা করে দিন)।’ (আবু দাউদ)

আল্লাহর আজাব থেকে বাঁচার জন্য আমাদের দ্বীনের ওপর চলতে হবে; নামাজ, কোরআন তিলাওয়াত, দান-সদকা ইত্যাদি নেক আমল বেশি বেশি করতে হবে।

হাদিস শরিফে আছে, ‘যখন কোথাও ভূমিকম্প হয় অথবা সূর্যগ্রহণ হয়, ঝড়ে বাতাস বা বন্যা হয়; তখন মানুষের উচিত মহান আল্লাহর কাছে অতি দ্রুত তওবা করা, তার নিকট নিরাপত্তার জন্য দোয়া করা এবং মহান আল্লাহকে অধিক হারে স্মরণ করা এবং ক্ষমা প্রার্থনা করা।’

রাসুলুল্লাহ (সা.) নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, ‘তোমরা দ্রুততার সঙ্গে মহান আল্লাহর জিকির করো, তার কাছে তওবা করো।’ (বুখারি: ২/৩০; মুসলিম: ২/৬২৮)

‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ধৈর্যের সঙ্গে ও নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করো, নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।’ (সুরা-২ বাকারা, আয়াত: ১৫৩)

আমাদের উচিত সামর্থ্য অনুযায়ী দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো ও সাহায্যের হাত প্রসারিত করা। হাদিস শরিফে আছে, ‘সদকা আল্লাহর অসন্তুষ্টিকে নিভিয়ে দেয় এবং অপমৃত্যু রোধ করে।’ (তিরমিজি: ৬০০)

উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, সবর আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আর সবরের মাধ্যমেই আমরা জান্নাতের দারপ্রান্তে পৌঁছাতে পারবো ইনশাআল্লাহ। যে ব্যক্তি আখিরাত ও আল্লাহর পথে সফর করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, তার জন্য একটি পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে। সে পতাকার দিকে ছুটে চলার প্রস্তুতি নিতে হবে। এ যাত্রার প্রতি মুহুর্তে আল্লাহর অনুগ্রহের দিকে তাকিয়ে নিজের দোষ ত্রুটিগুলো চিহ্নিত করতে হবে। কেউ যখন আল্লাহকে চেনে এবং গুনাহ ও প্রাপ্ত নিয়ামতের স্বীকৃতি প্রদান করে তখন সে নিজের ভালো কাজগুলোর ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে বলতে পারে না যে, এ কাজটি আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাচাবে, বরং সে বুঝতে পারে যে আল্লাহর ক্ষমা ও অনুগ্রহের উপরই সবকিছু নির্ভর করছে। আমরা

সবাই আল্লাহর মুখাপেক্ষী। সুতরাং আর বিলম্ব না করে এখনই তার নিয়ামতসমূহ স্মরণ করি; নিজেদের গুনাহগুলো স্বীকার করে নিই। যে ব্যক্তি আল্লাহর গুণাবলির মধ্যে থেকে কোনো একটি গুণ আকড়ে ধরে আল্লাহ তাকে একটি মাত্র গুণের মাধ্যমে নিজের কাছে টেনে নেন।বস্তুত মহান আল্লাহর পরিচয় লাভের মধ্যে দিয়েই হৃদয় সজীব হয়। আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে ব্যক্তি তার নৈকট্য অর্জন করে। যারা তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তারা পুরস্কার লাভ করে। যারা তাকে স্মরণ করে তারা তার সাহচর্য লাভ করে। যারা তার আনুগত্য করে তারা তার কাছে অত্যুচ্চ মর্যাদা লাভ করে। এমনকি যারা অবাধ্যতা করে তাদেরকেও তিনি হতাশ করেন না। তারা তাওবা করলেই তাদেরকে প্রিয়ভাজন করে নেন। দুঃখ দুর্দশা এবং বিপদ ও দূর্যোগের মাধ্যমে তাদের পরীক্ষা করেন। এভাবে তাদের পাপরাশি মাফ করে দেন। কারণ তিনি ক্ষমাশীল, পরম গুণগ্রাহী!

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। তার জন্য পবিত্র ও বরকতময় প্রশংসা। এমন প্রশংসা যা তিনি ভালোবাসেন এবং পছন্দ করেন। এমন প্রশংসা যা সেই মহান রবের সত্তা ও মাহাত্মের উপযুক্ত। এমন প্রশংসা যা আসমান ও যমীনে বিস্তৃত হয়ে আছে এবং এগুলোকে অতিক্রম করে গেছে। আমরা তার ব্যাপারে যা জানি আর যা জানি না, সবকিছুর জন্যই প্রশংসা। যে পরিমাণ প্রশংসা তার কলম থেকে নি:সৃত হয়, তার কিতাবে লিপিবদ্ধ হয় এবং তার ইলম জুড়ে থাকে সে পরিমাণ প্রশংসা।

দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তার পরিবার পরিজন,সাথীবর্গ ও সকল নবী রাসুলের উপর। কিয়ামত ও মহাপ্রলয় পর্যন্ত যারা তাকে উত্তমরুপে অনুসরণ করে চলবে তাদের প্রতি বর্ষিত হোক আল্লাহর সন্তুষ্টি ও করুনা। পরাক্রমশালী মহাপ্রজ্ঞাময় আল্লাহ ব্যতীত আমাদের কোনো শক্তি ও সামর্থ্য নেই। তিনি আমাদের জন্য যথেষ্ট। তিনিই উত্তম অভিভাবক।

তথ্যসূত্র

১. https://doislah.com/definition-and-types-of-patience/

২. https://www.banglanews24.com/islam/news/bd/396452.details
৩. https://www.kalerkantho.com/print-edition/islamic-life/2022/02/01/1116163
৪. https://www.jagonews24.com/amp/201787
৫. https://www.kalerkantho.com/print-edition/islamic-life/2021/10/18/1084160
৬. https://www.hadithbd.com/books/detail/?book=158&chapter=13237
৭. https://www.kalerkantho.com/online/Islamic-lifestylie/2024/08/04/1411740
৮. https://quraneraloblog.wordpress.com/2016/05/08/%E0%A6%A7%E0%A7%88%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%86%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%93-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%80/

৯.https://m.dailyinqilab.com/article/404983/%E0%A6%A7%E0%A7%88%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%8F%E0%A6%95-%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A7%8E-%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%A3
১০. বইঃ সবর
১১. বইঃ ধৈর্য হারাবেন না
১২. https://www.alokitobangladesh.com/print-edition/prophet-life/156428/%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%A7%E0%A7%88%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%B6%E0%A7%80%E0%A6%B2%E0%A6%A4%E0%A6%BE

১৩. https://www.kalerkantho.com/online/Islamic-lifestylie/2023/07/21/1300820

১৪. https://www.hadithbd.com/books/link/?id=3904
১৫. https://www.banglanews24.com/islam/news/bd/396452.details
১৬. https://www.shomoyeralo.com/details.php?id=171375
১৭. https://www.prothomalo.com/opinion/column/5ysv3knpse
১৮. সবর
১৯. [1] সহীহুল বুখারী ১৪৬৯, ৬৪৭০, মুসলিম ১০৫৩, তিরমিযী ২০২৪, নাসায়ী ২৫৮৮, ১৬৪৪, আহমাদ ১০৬০৬, ১০৬২২, ১০৬৬০, মুওয়াত্তা মালিক ১৮৮০, দারেমী ১৬৪৬
[1] মুসলিম ২৯৯৯, আহমাদ ১৮৪৫৫, ১৮৪৬০, ২৩৪০৬, ২৩৪১২, দারেমী ২৭৭৭
[1] সহীহুল বুখারী ১২৫২, ১২৮৩, ১৩০২, ৭১৫৪, মুসলিম ৯২৬, তিরমিযী ৯৮৮, নাসায়ী ১৮৬৯, আবূ দাউদ ৩১২৪, ইবনু মাজাহ ১৫৯৬, আহমাদ ১১৯০৮, ১২০৪৯, ১২৮৬০।
[1] মুসলিম ৩০০৫, তিরমিযী ৩৩৪০, আহমাদ ২৩৪১৩
[1] সহীহুল বুখারী ৫৬৫৩, তিরমিযী ২৪০০, আহমাদ ১২০৫৯, ১২১৮৫, ১৩৬০৭
[1] সহীহুল বুখারী ৫৬৪৫, আহমাদ ৭১৯৪, মুওয়াত্তা মালেক ১৭৫২